অবশেষে কি করিল নিদারুণ বিধি—
সোণার-কুসুম সম, নিরুপম অনুপম,
পাগল হইল পুত্র হৃদয়ের নিধি। ৬

সোণার শশাঙ্ক চারু প্রথম সন্তান!
সে যে উপযুক্ত ছেলে, পুত্রবধূ পাবে কোলে,
সুখের আশায় ছাই, দগ্ধ হ'ল প্রাণ। ৭

আঘাতে আঘাতে ক্ষত হইল হৃদয়,
শেষকালে একেবারে, ডুবায়ে সবে আঁধারে,
নিবিল জীবন দীপ, লভিলে চিন্ময়। ৮

কায়মনে পূজিয়াছ স্বামীর চরণ,
ননদ দেবরগণে, তুষিয়াছ প্রাণপণে,
দাসদাসী লোক জনে করেছ যতন। ৯

গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে সর্ব্বদা,
তব সম শুদ্ধমতি, রমণী বিরল অতি,
ছিল না অন্তরে তব কোন কূট ছলা। ১০

দেখ সতী! প্রাণপতি যে ছিল তোমার,
যে আগে তোমার তরে, প্রাণ দিত বুক চিরে
সেই আজি করিতেছে বিবাহ আবার। ১১

কাল তুমি ছিলে যাঁর হৃদয়ের ধন,
আজ তুমি গেছ মরে, সে পুনঃ বিবাহ করে,
হায় রে কি হলাহল সংসার বিষম! ১২

যে নাকি প্রাণের প্রাণ প্রাণ-কান্ত-মণি।
সে নাকি দু দণ্ডে ভুলে, অন্যেরে প্রেয়সী বলে,
হায় রে পতির প্রেম ক্ষণিক এমনি? ১৩

সংসারে এমনি যদি কুৎসিত নিয়ম,
তবে সতী পুণ্যবতী, পেয়ে গেলে অব্যাহতি,
এমন পতির প্রেমে কিবা প্রয়োজন? ১৪

তব পুণ্যময়ী স্মৃতি লইয়া আমরা
কতবার খেদ করি, কাঁদিব জীবন ভরি,
ভাবিতে ভাবিতে হব ভাবে আত্ম-হারা। ১৫

সংসার নরক-কূপে লভি অব্যাহতি।
যাও সতী স্বর্গপুরে, স্বরগ-কুসুম-ঘরে,
মহা আলোকের রাজ্যে দেবী পুণ্যবতী। ১৬

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

বিনয়।

পরম পিপাসা তীব্র রবির কিরণ;
মিলে যদি বৃষ্টি রূপ সাধু সন্দর্শন,
হৃদাকাশে সুবিস্তীর্ণ বিশ্ব মুগ্ধকর,
ভক্তি-ইন্দ্র চাপ উঠে পবিত্র সুন্দর।

বৃথা দর্প।

ধরণীর বক্ষ চিরি ফলফুল উঠি,
ফল রহে অবনত, ফুল রহে ফুটি।
ফুল কহে, "মোর গন্ধে মুনি মন হরে,"
ফল বলে, "শুধু গন্ধে পেট নাহি ভরে।"

অলঙ্কার।

রমণীর অঙ্গে উঠি কহে অলঙ্কার,
"দেখ নারী বাড়ায়েছি সৌন্দর্য্য তোমার।"
নারী কহে, "ধিক্ ধিক্ থাকো চুপ করে,
নির্লজ্জ হইলে আমি কে তোমা আদরে?"

নগর পল্লী।

নগর কহিছে ডাকি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে,
"কে না জানে মোর নাম এই ধরাধামে?"
পল্লী কহে, "অশান্তির আকর, নির্লজ্জ!
চেয়ে দেখ আমি থাকি কি আনন্দ মাঝ।"

(ক্রমশঃ)।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRICA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৯ বর্ষ। ৪৩৯ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৮; আগষ্ট, ১৯০১। | ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেক—রাজা ৭ম এড্ওয়ার্ডের ও তাঁহার পত্নী রাণী আলেকজান্দ্রার অভিষেক অনুষ্ঠান আগামী জুনমাসে সম্পন্ন হইবে।

বুয়রযুদ্ধ—সন্ধি হইল না, যুদ্ধ সমভাবে চলিতেছে। বুয়রেরা স্বাধীনতা না পাইলে আমৃত্যু যুদ্ধ করিবে জানাইয়াছে। তাহাদের এখনও ১৩।১৪ হাজার সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছে।

ভূমিকম্প—গত ৫ই জুলাই প্রত্যুষে সিলেটে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। ৩ বার গুরুতর কম্পনের পর গোঁ গোঁ শব্দ হইতে থাকে। ৩৪ দিনেও কম্পন এককালে নিবৃত্ত হয় নাই। ১৮৯৭ সালের জুনের নিম্নে এই ঘটনা।

ভূপালে রাজ্যাভিষেক—গত ৪ঠা জুলাই ভূপালের নূতন বেগমের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

নূতন প্রধান বিচারপতি—হাইকোর্টের জজ হারী ষ্টিফেন এলাহাবাদের চিফ জষ্টিস হইয়াছেন। ইঁহার বিচারে সুখ্যাতি আছে।

সূর্য্যে কলঙ্ক—এ বৎসর পৃথিবীতে গ্রীষ্মাধিক্যের কারণ স্বরূপ সূর্য্যে একটী নূতন কলঙ্ক জ্যোতির্বিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা সূর্য্যমণ্ডলে ৬২ কোটি, ২৫ লক্ষ বর্গ মাইল যুড়িয়া বিস্তৃত !!

কি সহৃদয়তা !—ইটালীর বিধবা রাণী মারগারিটা মৃতস্বামী হম্বার্টের স্মরণার্থ এক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহাতে হত পিতামাতার সন্তানেরা আশ্রয় পাইবে।

রুসিয়ায় জনসংখ্যা—১৭২৫ সালে সম্রাট পিটার দি গ্রেটের সময়ে রুসিয়ার অধিবাসি-সংখ্যা ৩০ লক্ষ মাত্র ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৩ কোটি ৬০লক্ষ হয়; এখন ১২ কোটি ৯০ লক্ষ হইয়াছে !!

দাতব্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগ হইতে নিঃশব্দে বেশ কার্য্য হইতেছে। ১৯০০ সালে ১৭টী বিধবা, ১৩টী ছাত্র, ১টী ছাত্রী, ৬টী অন্ধ ও ১টী কুষ্ঠরোগী ও ৫টী পরিবার মাসিক সাহায্য লাভ করিয়াছে। এ দাতব্য বিভাগ সাধারণের হিতার্থ, সাধারণের ইহাতে সাহায্যদান কর্ত্তব্য।

জেলের কয়েদী—১৯০০ সালে বঙ্গদেশের নানা স্থানের জেলের কয়েদী সংখ্যা ৩৯,৩২৪, ইহাদের মধ্যে এ বৎসর মৃত্যুর হার অধিক। জেলের অনেক লোকের ঘন সমাবেশে শ্বাস কাশ রোগে অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত্যু—কলিকাতার আর্চবিশপ [illegible]থালের মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। ইনি যেমন সুবিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন, সেইরূপ অর্থে সামর্থে ও উৎসাহকর বাক্যে ভারতের হিতকর সকল বিষয়ের সহায়তা করিতেন।

(২) পণ্ডিত কালীময় ঘটক বিসূচিকা রোগে সম্প্রতি গতাসু হইয়াছেন। তিনি বহুকালাবধি বামাবোধিনীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি একজন প্রবীণ শিক্ষক, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও স্বদেশানুরাগী লোক ছিলেন এবং ভক্তিপথে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিধাতা তাঁহার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

গীতাসার ব্যাখ্যা।

৪

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসোবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

নিরাহার দেহী ইন্দ্রিয় দ্বারা রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিষয় হইতে বিরত হয়, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিষয় রস হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হন।

জড় আতুর প্রভৃতি ব্যক্তি বিষয় ভোগে আসক্ত হয় না, তাহার কারণ ইহা নহে যে তাহাদের বিষয়ে অভিলাষ নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই যে উপবাসাদি দ্বারা তাহাদের শরীর শুষ্ক ও ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হওয়াতে সেই অভিলাষ কিছু কালের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ভোগ দ্বারা রস গ্রহণের শক্তি বর্দ্ধিত হইলেই আবার তাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে। একটা ব্যাঘ্রকে কিছুদিন আহার না দিয়া লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ রাখিলে তাহাকে শান্ত ও অহিংস্র দেখা যায়; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। আবার সুযোগ পাইলেই সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিংস্র প্রকৃতির পরিচয় দিবে। বিল্বমঙ্গল চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ করিয়া রূপবতী

স্ত্রীলোকের লোভ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের কুপ্রবৃত্তি তাহাতে গেল না। চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্বন্ধে রূপ যেমন, কর্ণ, ত্বক্, নাসিকা, ও জিহ্বার পক্ষে শব্দ স্পর্শ, গন্ধ ও রস সেইরূপ। এই সকল ভোগ্য বিষয়ের অভাবে মন কিছু দিনের জন্য শান্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ভোগাভিলাষ এককালে নিবৃত্ত হয় না। দন্তহীন কুকুর যে অস্থি চর্ব্বণ করে না, সে কেবল চর্ব্বণ করিতে পারে না বলিয়া; কিন্তু তাহার চর্ব্বণের ইচ্ছা যায় না। এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়া ভোগবিরত হইতে দেখা যায়। স্থূলদর্শী লোক মনে করিতে পারে যে ইহারা বিষয়ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, সাধু; কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শী ব্যক্তিগণ সেরূপ ভাবেন না। বাধ্য হইয়া যাঁহারা বিষয় ত্যাগ করেন, তাঁহা-দিগকে আবার ঘোরতর বিষয়ী হইতে দেখা যায়। কত মদ্যপায়ী কারাবাসী হইয়া মিতাচারী হয়, কিন্তু কারামুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাতাল হইয়া পড়ে। ইহার কারণ প্রবৃত্তির বীজ সূক্ষ্ম-রূপে তাহাদের অন্তরে থাকে, বাহ্য বাধা দ্বারা তাহা চাপিয়া রাখ, সে চাপ একটু সরিলেই আবার তাহা নিজ স্বভাব ধারণ করিবে। রবারের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ হেতু চাপিলে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, কিন্তু চাপ অপসৃত হইলেই তাহা দ্বিগুণ বলে পূর্ব্বাকার ধারণ করে। মানুষের মন রবারের অপেক্ষাও স্থিতি-স্থাপক, তাহাকে চাপিয়া দমন করা যায় না। বাহ্য বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী, হস্তিস্নানের ন্যায় বিফল। বনপ্রয়াণ, কৃচ্ছ্রসাধন, ভেক ধারণ দ্বারা বিষয়াসক্তির প্রকাশ বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু বিষয়াসক্তি এক-কালে নির্ম্মূল হয় না।

বিষয়াসক্তি এককালে নির্ম্মূল হয় কিসে? পরব্রহ্মের দর্শনলাভে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শনের ফল উপনিষদে বর্ণিত আছে :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

পরমোৎকৃষ্ট বস্তু যে পরমেশ্বর তাঁহার দর্শনে জীবের হৃদয়ের গ্রন্থি যে কুটিল প্রবৃত্তি ও বিষয়াসক্তির বন্ধন, তাহা ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় দূর হয় এবং তাহার কর্ম্মবন্ধনও শিথিল হয়।

"ভূমৈব সুখং" ভূমা-মহান্ ঈশ্বরেতেই সুখ। "রসোবৈষঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইনি রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, ইহাঁকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়।

পূর্ণ প্রেমের আধার সৌন্দর্য্যের সার পূর্ণানন্দ পরমেশ্বরের যে দর্শন পায়, সে তাঁহাতেই বিমোহিত হইয়া যায় এবং তাঁহার আনন্দ রস পানে মত্ত হয়। ব্রহ্মানুরাগ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ানুরাগ আপনা আপনি চলিয়া গিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যে পূর্ণচন্দ্র দেখে, সে কি আর জোনাকী পোকার শোভা দেখিতে চায়? যে স্বর্ণখনি পায়, সে কি আর কাচ খণ্ড লক্ষ্য করে? যুবতী রমণী যখন

আপনার প্রাণ প্রিয়তম স্বামীকে পায়, তখন কি তার খেলাঘরের পুতুল খেলা ভাল লাগে? ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্যদেব পরমার্থ-প্রেমে বিভোর হইয়া বিষয়-ভোগ-বিলাসকে "কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম" বলিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ যাঁহাদের ভোগ্য, অসার বিষয় তাঁহাদের নিকট নীরস, মলিন ও অরুচি-কর। মন ব্রহ্মানন্দে আসক্ত হইলে আর কোনও তাড়না ও প্রলোভনে বিচলিত হয় না। শুনা যায় হরিণ বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া সহজে ব্যাধের হস্তে ধরা পড়ে। যে হরিণকে কাঠগড়ায় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া স্থির রাখা যায় না, সে বংশীর ধ্বনি এমনি মোহিত হইয়া শ্রবণ করে যে তাহাকে প্রহার করিলেও নড়ে না। ঈশ্বরের নাম চিত্তহরণ, মনোমোহন, প্রাণারাম, আত্মারাম, তাঁহাকে বিশ্বাস ও ভক্তির চক্ষে দেখিয়া জীব বিশুদ্ধ পরমানন্দে পরিপ্লুত হয়; মলিন ইন্দ্রিয় সুখবাসনা তাহার বিলুপ্ত হয়। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছিন্ন যোগ হইলে এই ভাবের উচ্ছ্বাস উঠে:—

"আমি কেমনে ছাড়িব তোমারে,
ছেড়ে কোথায় বা যাব হে?
(আমার অন্তরে বাহিরে তুমি)
(আমার নয়নের মণি তুমি)
তুমি প্রাণ-প্রাণ প্রাণারাম প্রাণ-
অবলম্বন হে।
তুমি সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং
মধুরং মধুরং হে।"

মাতৃদেবী ৺ বামাসুন্দরীর জীবনী।

(৪৪৮ সংখ্যা—৭১ পৃষ্ঠার পর)।

মাতৃদেবী এমনই অসামান্য শান্ত ও ধৈর্য্যশীলা ছিলেন যে কেহ কদাচ তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে নাই। শত প্রকারে উৎপীড়িতা হইয়াও নীরবে অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কাহারও নিকট অভিযোগ করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। আজীবন তাঁহার এই দেবপ্রকৃতি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি সম্পন্ন পিতার এক মাত্র দুহিতা হইয়াও নিজ বধূ-জীবনের অসহ্য ক্লেশকাহিনী একবারও মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। তাঁহার পিতৃগৃহের সকলে অনেক কৌশল করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে শ্বশুর গৃহের কোনও নিন্দাবাদ বাহির করিতে পারেন নাই। আমার প্রথম ভ্রাতা আমাদের বিক্রমপুরের বাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সূতিকালয়ের দোষে "পেঁচোয় পাওয়া" রোগাক্রান্ত হইয়া সূতিকালয়েই প্রাণত্যাগ করেন। এই দুর্ঘটনার পরে পিতৃদেব মাতৃদেবীকে দেশের বাটীতে রাখা বিহিত বোধ না করিয়া স্বীয় কর্ম্মস্থল ময়মনসিংহ নগরীতে লইয়া গেলেন,

পরিবারস্থ সকলেই তাঁহাদের সহিত তথায় গমন করিলেন। এই স্থলেই আমার জন্ম হয় এবং পূর্ব্ববারের ন্যায় সূতিকালয়ের দোষে যাহাতে আমার মৃত্যু না ঘটে, সেই জন্য সভ্যসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ জন্য পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে পিতামহীদেবীর নিকট বিস্তর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইস্থলে অনেক পরিবারের সহিত অচিরকাল মধ্যেই মাতৃদেবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল এবং তাহারা সকলেই নিজ পরিজনের ন্যায় তাঁহাকে আদর ও যত্ন করিতেন। শৈশবের ক্রীড়াভূমি ময়মনসিংহ নগরীর কথা মনে হইলেই সেই সুন্দর পারিবারিক চিত্রটী হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। আমার জন্মাবধি মাতৃদেবী পিতৃদেবের সহিত বঙ্গ দেশের নানা স্থানে বাস করিয়া সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। মাতামহ মাধবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্বর্গারোহণকালে আমার পরম স্নেহশীলা পিসিঠাকুরাণী মৃত্যু শয্যায় শয়ান ছিলেন। সেই সময়েই মধ্যমা ভগ্নী সু...জন্মগ্রহণ করে। চিকিৎসকের উপদেশ মত মাতৃদেবী শুধু স্তন্য দুগ্ধ পান করাইয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহার মুমূর্ষু জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মাতৃদেবী সূতিকালয়ে আবদ্ধ ছিলেন। আমি একটী বাটীতে করিয়া দুগ্ধ বহনপূর্ব্বক পিসীমাকে পান করাইতাম এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শেষ সম্ভাষণ মাতৃদেবীর নিকটে দৌড়িয়া যাইয়া দিতাম। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির দিনে মাতৃদেবী বলিলেন দেখ্, তুই দৌড়িয়া যাইয়া "সোণা পিসীমাকে" জন্মের শোধ ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া আমাকে সব কথা ঠিক্ ঠিক্ বলিবি। রাত্রিতে খিড়কীদ্বারে কাল ছায়াপাত দেখিয়াছি, তাঁহার আর রক্ষা নাই; আজই জীবনের শেষ দিন।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মাতৃদেবী ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে "সোণাপিসীমাকে" দেখিবার জন্য দৌড়িলাম। গৃহে লোকে লোকারণ্য। দাদা রামসুন্দর সিংহ আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল "বোন, এ ঘরে আর যাইও না, রাত্রিতে কাল ছায়া দেখিয়াছি, এখনই পিসীমা স্বর্গারোহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।" এ কথা এবং পিসীমার বিকট কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া প্রাণ যেরূপ শোকপূর্ণ হইল, বর্ণনীয় নহে। মাতৃদেবীর কাছে যাইয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া প্রায় সারাদিন ক্রন্দন করিতে করিতে অতিবাহিত করিলাম। পিসীমা সৌদামিনী নাম্নী একটী এক বৎসরের রূপবতী কন্যা রাখিয়া গেলেন। মাতৃদেবী নিজকন্যার সহিত তাহাকে স্তন্য দান করাইয়া পালন করিতে লাগিলেন। আমি ভিন্ন অন্য ভ্রাতা ভগ্নীদের বিশ্বাস ছিল যে সৌদামিনী আমাদের আপন সহোদরা, বড় হইয়াও এ বিশ্বাস অপনীত হয় নাই। মাতৃদেবী অসাধারণ পরিশ্রমশীলা ও পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়া ছিলেন। তাঁহার গুণে আমরা যত অপকৃষ্ট

স্থানে বাস করিয়াছি, তাহাও স্বর্গপুরীতে পরিণত হইয়াছে। ভাণ্ডারগৃহ, শয়নাগার উদ্যান তাঁহার গুণে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইত। "আঁস্তাকুড়" নামক স্থান আমরা পিতৃগৃহে দর্শন করি নাই। আচমনের স্থান পর্য্যন্ত যূঁই বেলী চামেলী প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পপূর্ণ ছিল। মাতৃদেবীর পরিশ্রমশীলতা দর্শনে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। সম্পন্ন ও পদস্থ লোকের সহধর্ম্মিণী হইয়া চিরকাল তিনি রন্ধনাদি গৃহস্থালীর কার্য্যে অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতেন। পীড়ার সময়েও কার্য্যে তাঁহার বিন্দু পরিমাণ আলস্য ছিল না। সকল অবস্থায় তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমশীলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে আমরা মোহিত হইয়াছি। তিনি যে কার্য্য করিতেন অতি পারিপাট্য ও শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার শোভানুভাবকতাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। আমরা কি স্নেহময়ী মা পাইয়াছিলাম, তাহা আমরাই জানি। বয়স্ক সন্তানদের শিরোদেশে উপাধান আছে কি না, কোনও সন্তান জল পান করিবে কি না, গভীর রাত্রিতে অনুসন্ধান না করিয়া কদাচ শয়ন করিতেন না। সন্তানের উৎকট পীড়া হইলে ব্যাকুল হৃদয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। সন্তানগণ যতদিন অন্নাহার না করিত, নিজে প্রায় অন্নাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক সামান্য দ্রব্যাদি মুখে দিয়া কোনও রূপে প্রাণ ধারণ করিতেন। আমরা তাঁহার ন্যায় করুণাময়ী জননীদেবী প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ মমতা, স্বাধীনতাতে বর্দ্ধিত হইয়া পরমানন্দে সুখের শৈশব অতিবাহিত করিয়াছি।

অতিথি অভ্যাগতকে আদর অভ্যর্থনা করিতে তিনি সুপটু ছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিনই সম্মুখীন হইয়া মুখে আত্মীয়তা-ব্যঞ্জক কথা বলিতে জানিতেন না। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল। আমরণ সেই কর্ত্তব্য প্রাণান্ত করিয়া শত দুঃখ বিপত্তির মধ্যেও পালন করিয়া গৃহিণী-জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ভাল সুবিধা অভাবে তিনি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু অসীম ধৈর্য্যশালী ও সুবুদ্ধিশালিনী ছিলেন বলিয়া শুদ্ধ নিজের ঐকান্তিক অধ্যবসায় গুণে বাঙ্গালা ভাষা একরকম শিখিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" "বামাবোধিনী পত্রিকা" প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া নিয়মিত রূপে পাঠ করিতেন এবং তদনুসারে জীবনকে গঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে পিতৃদেবকে নিয়মিত রূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। দেশীয় প্রচলিত কোন কুসংস্কার তাঁহার উন্নত হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি মনে মুখে একবিধ কার্য্য দর্শন না করিলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেন। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া পৌত্তলিক প্রণালীতে সামাজিক কার্য্য যাঁহারা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহা-দিগকে আত্ম-দুর্ব্বলতার জন্য কঠোর

তিরস্কার করিতেন। উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়াও তিনি দেশীয় মন্ত্রপূত মাছলী কবচ প্রভৃতি ধারণে কদাচ সম্মত হন নাই, কিম্বা আমাদিগকেও ধারণ করিতে দেন নাই। ভ্রাতা জ—জন্মাবধি কঠিন রোগাক্রান্ত ছিল, কেহই তাহার জীবনের আশা করেন নাই। আমাদের সহোদরোপম বিশ্বাসী ভৃত্য রামসুন্দর সিংহ কোনও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে একটী মাছলী সংগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রাতার কটিদেশে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই দিনই তাহার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মাতৃদেবী মাছলী দর্শনমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা উন্মোচন পূর্ব্বক কূপে নিক্ষেপ করিতে আমায় আদেশ করিলেন। আমিও ক্রন্দন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ সম্পন্ন করিয়া আসিলাম। বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে ঈশ্বর ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিবেন না, মাতৃদেবী গোপনে আমাকে এই কথা বলিয়া কত দিন অনাহার অনিদ্রায় ভূমিতে লুটাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

পিতামহীদেবী পরমনিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী ছিলেন। তিনিও মাতৃদেবীর বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কোনও কার্য্য করাইতে সমর্থ হন নাই। বাস্তু পূজার "চরু" ভক্ষণ কুসংস্কার কি না? মাতৃদেবীকে তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরাও তাহা ভক্ষণ করি নাই। পূজাদি কার্য্য দূর হইতে দর্শন করিলে পাছে ঈশ্বর বিরক্ত হন, এ আশঙ্কায় মন ব্যাকুল হইত এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইয়া মাতৃদেবীর ব্যবস্থাগ্রহণ করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতাম। আমরা বাল্যকাল হইতে দেবতাসদৃশ পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর পবিত্র সহবাসে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া আজীবন কুসংসর্গের প্রলোভন যে কি তাহা বুঝিতে পারি নাই। পিতামাতা মুখে ধর্ম্মোপদেশ তত দেন নাই; তাঁহারা যে কর্ম্ম করেন না, তাহা নিশ্চয়ই মন্দ—আমরা ভাই ভগ্নী সকলে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া বাল্য-জীবন নিরাপদে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। মাতৃদেবীর চরিত্রের প্রধান সৌন্দর্য্য ছিল পিতৃদেবের প্রতি সর্ব্বতো-ভাবে শ্রদ্ধার ভাব। আমরা ভাই ভগ্নী সকলে কঠোর শাসনের মধ্যে না থাকিয়াও পিতামাতার ইচ্ছাই আইনরূপে মান্য করিতাম, ইহা শৈশব হইতে আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মাতৃদেবী জীবনে কোনও বিষয়ে পিতৃদেবের ইচ্ছা অণুমাত্র অতিক্রম করিয়া চলেন নাই—এমন কি তিনি ঠিক্ ছায়ার ন্যায় আজীবন পিতৃদেবের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। ভাই ভগ্নীর গুরুতর পীড়ায় সময় পিতৃদেব স্বর্গগত সুচিকিৎসক ডাক্তার ভোলানাথ বসুর প্রতি চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। অন্যান্য পরিবারবর্গ "এ ডাক্তারের ঔষধ কোন কাজের নয়, কবিরাজ কি হাকিম ডাকাও নতুবা ছেলে বাঁচিবে না" বলিয়া মাতৃদেবীকে কত ভয় প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু পিতৃদেবের প্রতি তাঁহার এত শ্রদ্ধা ও নির্ভরের ভাব ছিল

যে "যাহা ভাল, তাহাই তিনি করিবেন" এই বলিয়া সেই পরীক্ষার সময়েও কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক অনশন অনিদ্রায় সন্তানের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(৪৩৮ সংখ্যা—৭৫ পৃষ্ঠার পর)।

(সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা রকম অবস্থার বর্ণনা আছে। সে জ্ঞানপথ—সে বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধির কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে সে জ্ঞান হয় না। ও পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

"এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির (Planes) কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি এই তিনটী মনের স্থান। মনের তখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। মন এখানে আসিলে প্রথম চৈতন্য হয়, আর চারিদিকে জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক্ হয়ে বলে, 'একি! একি!' তখন তার নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যখন কণ্ঠে উঠিয়াছে, তখন অবিদ্যা-অজ্ঞান সব দূরে গিয়াছে, তখন ঐশ্বরিক কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, তা হ'লে সে ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন যেখানে গেলে অহর্নিশি ঐশ্বরিক রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হয়ে সেইরূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয় সেই আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তমভূমি—যেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই সপ্তমভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

"এই কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ তোমাদের নয়। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।

সমাধি ও কর্ম্মত্যাগ।

"আমায় একজন বলিতেছিল 'মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন?' (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হ'লে কর্ম্মত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। তারপর যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নামগুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ তোমার নাম গুণ-কথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল! তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন'—আর তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে গেল।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে, হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্চে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, দাদা! আমার একি হ'ল! হলধারী বল্লে, একে গলিত হস্ত বলে,—ঈশ্বরের দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না।

"সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতাহাতী'—'নিতাই আমার মাতাহাতী।' ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে, "হাতী হাতী।" তার পর কেবল 'হাতী' এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে 'হা' বল্‌তে বল্‌তে ভাব সমাধি হয়। তখন যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছিল, সে চুপ হয়ে যায়।

"যেমন ব্রাহ্মণ ভোজন। প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে করে বস্‌ল, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হ'তে থাকে। তার পর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল, তখন সুপ্ সুপ্ (সকলের হাস্য), শব্দ নাই বল্লেই হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ। তাই বল্‌ছি, প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কর্ম্ম কম্‌বে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম্ম প্রায় কর্‌তে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে।"

(সমাধিস্থ মহাপুরুষ ও লোকশিক্ষা প্রদান।)

সমাধিস্থ হইবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কা'রু কা'রু লোক শিক্ষার জন্য শরীর থাকে, যেমন নারদাদির, আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের

দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হইলেই হ'ল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোৎ বল্লে মুৎবে না, পাছে তোমার উপকার হয় (সকলের হাস্য)! ছ পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আন্‌তে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু শক্তি বিশেষ বিশেষ। সামান্য আধার লোক শিক্ষা দিতে ভয় করে! হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করিয়া ভেসে যায়, একটা পাখী এসে বস্‌লে ডুবে যায়। কিন্তু নায়দাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শিবনাথের প্রতি) হাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তাঁরা সব ওখানে (কালীবাড়ীতে) গি'ছিল। আমি বল্লুম, তোমরা কি রকম 'লেক্‌চার' দাও, আমি দেখ্‌ব। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব বল্‌তে লাগিল। বেশ বল্লে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বল্লুম তুমি এ গুলো এত বল কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ এই সব। যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে; তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে ভালবাসে। যখন রাধা-কান্তের গহনা চুরী গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগিল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গহনা রক্ষা করতে পারলে না!' আমি সেজবাবুকে বল্‌লুম, 'ও! তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যার দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব! এ গহনা তোমার পক্ষেই ভারি একটা জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটীর ড্যালা। ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নেই, তুমি কি ঐশ্বর্য্য তাঁকে দিতে পার?' তাই বলি, যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে চায়। তার দেশ কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধন, কজন দাস দাসী, এর খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে (বিবেকানন্দকে) যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তারা কটী ভাই, ওসব কথা একদিন তাকে ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য্য কত? অত খবরে আমাদের কাজ কি?'

আবার সেই গন্ধর্ব্ব-বিনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমা পূর্ণ গান:—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥

খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে
বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, ;জ্বলবে সদা
অনুক্ষণ।
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায়
আবার সে কোন্ জন ?
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর
শ্রীচরণ॥

(ভক্তি ও লীলা ।)

"তবে তাঁকে দর্শনের পর ভক্তের ইচ্ছা হয় যে, তাঁর লীলা কিছু দেখি। যখন রামচন্দ্র রাবণ বধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ কল্লেন, তখন বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মণ বল্লেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, আর এত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে! রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, নিকষা বল্লে, রাম এত দিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে যে, তাহ'লে তোমার আরও কত লীলা দেখ্‌ব। (সকলের হাসা)।

(শিবনাথের প্রতি) "তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে শুদ্ধাত্মাদের না দেখ্‌লে কি নিয়ে থাক্‌ব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্ব্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।

জন্মান্তর।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমি শুনেছি, জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝব? অনেকে বলে গেছেন, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না। ভীষ্মদেব যখন দেহ ত্যাগ করবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়াইয়া। তাঁরা দেখ্‌লেন যে ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়া জল পড়ছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, "ভাই, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, যিনি অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদচেন!" শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বল্লেন, "কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সে জন্য কাঁদছি না। আমি যখন ভাব্‌ছি যে, যে পাণ্ডবদের তুমি স্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখের বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। ততক্ষণ প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটা হইয়াছে। সন্ধ্যার চারি পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতাপল্লব শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া

বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতে লাগিল। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতে পাইল, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত শ্রীযুক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ভাগবতভক্ত ভগবান জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।"

বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন, সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

বনভোজনে।

মে মাসের প্রারম্ভে আমার ছুটি হইয়াছে। কলেজ বন্দ হইলে বাড়ী যাবার চেষ্টা। আবার মেডিকেল কলেজে ফাষ্ট সেকেণ্ড ইয়ারে (১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে) এই সময় ছুটি হয়। একবারে আমাদের সহপাঠীরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে গেলেন, আমি এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম। আজ এক সপ্তাহ হইল বাড়ী আসিয়াছি, তবু প্রবাসের গল্প আর ফুরায় না। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে যতটুক ডাক্তারী পাঠাদি, তাহাও বউ দিদি ও আমার ছোট বোন শেলির কাছে বল্‌তে হচ্চে। শেলির সম্পূর্ণ নাম শেফালি,, কিন্তু আমরা 'শেলি' বলে ডাকি, অবশ্য তার ছোট মুখে একটি কবিত্বের ছায়া প্রতিভাসিত হইত। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ঐ একটি ভগ্নী, তাই সকলে বলে 'তোমরা একে ভারি আদুরে মেয়ে করেছ।' শেলি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। আমার পিতা কুলীন ব্রাহ্মণ, তাই আমাদের মেয়ে বড় হলেও তত দোষ হয় না। কিন্তু এখানে তা নয়, আমরা পশ্চিমে থাকি, তাই পাত্রের অভাব আর গত বৎসর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মারা যাওয়াতে আরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। মা আমার দিদির অভাবে বড় কাতরা। এক বৎসর পরে বাড়ী আসিয়াছি, কিন্তু একদিনও পিতা মাতার প্রফুল্ল মুখ দেখি নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ বৎসর বি এল্‌, পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বেনারসে প্রাক্‌টিস করেন ও পিতাকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার সুযোগ দেন। কিন্তু কনিষ্ঠা

শেফালীর বিবাহই প্রধান অন্তরায়। ছোট ভাইটি মিড্‌ল ক্লাসে পড়ে। সেও আমার বড় অনুগত। আমরা সকলে ভাই ভগ্নী মিলিয়া শোকাতুরা মাতাকে সান্ত্বনা করিতে দিবানিশি চেষ্টা করি। মাকে অবসর পাইলেই মহাভারত ও রামায়ণের সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা গুলি শুনাই, কখন কখন সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাই। এই প্রকার আনন্দে ছুটির দিনগুলি শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইয়া যাইতেছে। একদিন শেলি বল্লে "এস, দাদা একদিন বনভোজনে যাই চল না।" বউ দিদি সৌৎসুক্যে তাহাতে উৎসাহ দিলেন। আমি বলিলাম "বেশত।" কিন্তু মাতার অনুমতির অপেক্ষা, বিশেষ আমরা তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে চাহি না। অথচ তিনি নির্জ্জনে থাকিতেই ভালবাসেন। শেলির আগ্রহে মা বলিলেন 'আচ্ছা, তোমরা যেও, আমার কাল যাওয়া হবে না যেহেতু শ্বশুর মহাশয়ের বাৎসরিক তিথি, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে।" সকলে তাহাতেই আনন্দে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। শেলি বল্লে "কাল না গেলে আমার যাওয়া হবে না, কাল শনিবারে আমার স্কুলের ছুটি আছে।" অগত্যা তাহাই স্থির হইল। এখন কথা কোথায় যাওয়া হবে।

বউ দিদি বলিলেন "ভাই, আমি ঝুঁসি কখনও দেখি নাই, এইবার চল ওপারে নৌকা করে বেড়িয়ে আসি, দেশ থেকে এসে অবধি নৌকায় উঠি নাই।" সকলে তাহাতেই রাজি হইলেন। সেখানে গিয়ে বউদিদি রাঁধবেন আমরা খাব, ইহাও তাঁহার সঙ্গে ঠিক্ করা হলো, যেহেতু বউদিদি মহাশয়া হাঁড়ি হেঁশেলকে বড় ভয় করিতেন। রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখলেই চোক লাল হয়ে মাথা ধরিত। কিন্তু আজ আর তিনি পিছপা নন। আমার ছোট ভাই গুণনাথ সেও প্রস্তুত হইল। শেলির কথাই নাই, অধিকন্তু তাহার সঙ্গিনী নলিও সেই সময় আমন্ত্রিত হইলেন। নলিনী আমার পিতার বন্ধুর কন্যা, শেলির সমবয়স্কা ও সহপাঠিনী। আমরা পাঁচ জন বনভোজনের যাত্রী, ইহা ছাড়া একজন দাসী ও চাকরও সঙ্গে যাইবে মা বলিলেন। কোন মতে রাতটা পোহাইল। সর্ব্বাগ্রে শেলি উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া নলিকে আনাইয়া লইল। ক্রমে আমরা সকলেই প্রস্তুত হইলাম। মা আমাদের আহারের সামগ্রী সকল গুছাইয়া দিলেন। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দারাগঞ্জের ঘাট পর্য্যন্ত গেলাম। সেদিনকার প্রাতঃকাল তত পরিচ্ছন্ন ছিল না, আকাশ যেন ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। মা একবার উপরদিকে চাহিয়া বলিলেন "যাচ্চ তোমরা, মেঘ করেছে যেন।" আমাদের যাইবার উৎসাহ এত বেশী যে সে কথার প্রতি আর কাহারও মনোযোগ হইল না। মহানন্দে আমরা যাত্রা করিলাম ও দারাগঞ্জের ঘাট হইতে একখানি নৌকা করিয়া সকলে পারে চলিলাম।

গুণা ঘড়ি খুলিয়া দেখিল বেলা ৯টা হইয়াছে, কিন্তু রবির নবীন ছবি গঙ্গা-বক্ষে শোভিতেছে না। নৌকা তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। প্রভাত-পবন চপলমতি বালকের ন্যায় জাহ্নবীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ধরিয়া নাচিতেছে, কখন ঘোমটা খুলিয়া দিতেছে, কখন অাঁচল খানি লইয়া দোলাইতেছে, গঙ্গা-বধূর বীচিমালা যেন বঙ্গ কামিনীর অঞ্চল-বদ্ধ চাবির গোছার মতন যেখানে সেখানে ছড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে! দুধারে সৈকত তীরে আজ আর বেশী লোক জনের সমাগম নাই। পক্ষিগণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া নীড় ছাড়িয়া উঠিতেছে না। আমরা সকলে সূর্য্যদেবের অভাবে যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। বউদিদির আর সে হর্ষোৎফুল্লতা দেখা যাইতেছে না। শেলি নলিও চুপ করিয়া বসিয়া কেবল নৌকার গতি, জলের তরঙ্গ, পবনের রঙ্গ ও মেঘের গম্ভীর বদন দেখিতেছে। মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বায়ু প্রতিকূল নহে। ক্রমেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। নৌকা ঘাটে লাগিল, আমরা সদলে নামিলাম ও কিছু-দূরে গিয়া একটি বাগানে বৃহৎ বকুল বৃক্ষ-তলে বসিলাম। দাসী ও চাকর আহা-রের আয়োজন করিতে লাগিল। শেলি নলি বউদিদির সঙ্গে গেল ফুল তুলিতে। আমরা দুই ভাই উদ্যানের পার্শ্বস্থ একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে গেলাম। গঙ্গাতীরের উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে একখানি বাড়ী, কিন্তু প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন। একখানিতে যত ফকির সাধু আসিয়া আশ্রয় লয়, অপরটিতে সন্ন্যাসীর আশ্রম ও শিষ্যেরা বাস করে ও তদুপরিস্থ ভূমি-খণ্ডের উপরি ভাগে একটি কূপ, শুনিলাম ইহা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলিয়া ইহার জল বিখ্যাত। সেই কূপের সন্নি-কটে একটি ছোট খাট ফুল বাগান। ক্রমে সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলার সহিত ভাব করিয়া বাবাজীর নিকটে গেলাম। বাবাজী একখানি মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট ও শীর্ণকায়, বয়স পঞ্চাশতের কম নহে। প্রশান্ত মূর্ত্তি। আমাদিগকে ইঙ্গিতে বলিলেন এ সময় কেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ? পরে অন্যান্য অনেক প্রকার উপদেশপূর্ণ আখ্যান কহিলেন। বাবাজীর গৃহে একটি সেতার ও কতক-গুলি পুরাতন পুঁথি গেরুয়া বস্ত্রে আচ্ছা-দিত রহিয়াছে। শিষ্যজি কহিলেন গুরু ইচ্ছামত গীতা আবৃত্তি করেন। ইহার পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। ইচ্ছা হইল সহযাত্রীদিগকে ফিরিবার সময় দেখাইয়া লইয়া যাইব। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখি, বাগানে মহা ধুম, বউদিদির হাতে হাঁড়ি! শেলি নলি চাল ধুইতেছেন, কুটনা কুটিতেছেন, দাসী চাকরকে বাধা দিয়া জল আনিতেছেন। বড় আনন্দ! আমিও ইহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার স্ফূর্ত্তি কমিয়া গিয়াছে। যাহোক খাওয়া দাওয়া হলো, ক্রমেই

আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া ঘাটে আসিয়া মাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম দেখিতেছ, এখন কি নৌকা ছাড়িবে?" তাহারা কহিল "এখনও কোন ভয় নাই, আমরা বাড়ী পৌঁছাইয়া যাইব, ঢের সময় আছে।" সেই বিজ্ঞ কর্ণ-ধারের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। কিছু দূর যাইতে যাইতে বায়ুর বেগ প্রবল হইতে লাগিল, তখন মাঝ গঙ্গায় নৌকা আর কি হইবে? মাজিরা পাল খুলিয়া গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমেই চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পূরিয়া গেল, ঝড় দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গঙ্গার তরঙ্গের ধ্বনি বায়ুভরে কম্পমান! ঢেউগুলি গায়ে গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে—ক্রমে নৌকার তলভাগে লাগিতেছে—কূলে কূলে গিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ঝড় সত্যসত্যই প্রবল বেগে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া মাটি ধূলা বালি উড়াইয়া সবেগে নৌকা আক্রমণ করিল। গুণের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, মাজিরা আছাড় খাইয়া পড়িল। বালিকা দুইটি এ উহাকে প্রাণপণে ধরিয়া আমার কোলে মাথা দিয়া পড়িয়াছে। আমাদের বৌদিদি গুণনাথকে আশ্রয় করিয়া আছে। জলে যেমন তরঙ্গ, আমাদের প্রাণে তেমনি ভয়ের তরঙ্গ, হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করিয়া আসন্ন মৃত্যু গণিতেছে। আমার ভাবনা—কি করিয়া এই বিপদ হইতে ভাই ভগিনীগুলির প্রাণ বাঁচাইব। কোনও উপায়ই ঠাওরাইতে পারিতেছি না। ঝড়ের জোরে নৌকা ঘুরিয়া ফিরিয়া জলে পূরিয়া গেল। তখন আমরা উহা হইতে লাফান স্থির করিলাম। কিন্তু হতভাগ্য বালিকারা যে সাঁতার জানে না। তবু আমি শেলি নলিকে বলিলাম "আমার কোমর ধর।" বউদিদি ও গুণা সাঁতার জানিতেন। নৌকা ছাড়িয়া আমরা সেই অন্ধকারে তরঙ্গ-সঙ্কুল জাহ্নবীর কোলে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতোভিমুখে চলিলাম। দুইটি বালিকাকে টানিয়া টানিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আর পারি না, কূল কিনারা বা কোথায়? এক একবার বিদ্যুদালোকে কেবল জলের তোলপাড় চক্ষে পড়িতেছে। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া যে কোন্ দিকে গেলেন, তাহার ত চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আরও বিপদে মগ্ন হইলাম। মেয়ে দুটির হাত আমার কোমর হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই আমি নিজে হাল্‌কা হইয়াছি। এদিকে ঝড়ের বেগও প্রশমিত হইয়া আসিল। আমি যথাসাধ্য বলে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিলাম। তখনও বাতাস এক এক বার সোঁ সোঁ রবে ক্রোধাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। কূলে গিয়া সেই বালু ভূমিতে আর্দ্রবস্ত্রে পড়িয়া থাকিলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত। নির্জ্জন নীরব তটদেশে জন মানবের চিহ্ন নাই, কেবল দূরে একখানি কুটীরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিয়া উঠিল। অবসন্ন

দেহ প্রাণ লইয়া উঠিলাম। এ মুমূর্ষু প্রাণে কিসের বল, কোথা হইতে আসিল, পাঠক পাঠিকারা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমার জীবনের জীবন ভাই ভগ্নীগুলির উদ্দেশ এক্ষণে প্রাণে শত বল শত উদ্যম যোগাইতেছে। আমি সেই ক্ষীণালোক ধরিয়া কুটীর অভিমুখে গমন করিলাম। বাহির হইতে দেখি কেহ কোথায় নাই, একটি স্ত্রীলোক বসিয়া কেবল জপ করিতেছেন। আমি যাইতেই জপ ভঙ্গ করিয়া, স্বয়ং জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি এমন দুর্য্যোগে?"

(ক্রমশঃ)।

বাকী।

১

হয়ে গেছে সব বিভো! হয়ে গেছে সব,
ভাঙিয়াছে উষা রাণী মধুমাখা খেলা,
কূজনিয়া কলকণ্ঠ হয়েছে নীরব,
ঝরিয়াছে যুথি, জাতি, গন্ধরাজ, বেলা।

২

হয়ে গেছে সব বিভো! হয়ে গেছে সব,
ক্ষুদ্র সাধ ক্ষুদ্র আশা পূরেছে সকলি,
পেয়েছি সোণার শিশু—ত্রিদিব-বৈভব!
শুনেছি সে চাঁদ মুখে অমৃত কাকলী!

৩

হয়ে গেছে সব প্রভো! হয়ে গেছে সব,
সব কাজ সারা আজি—যা' ছিল করিতে,
চিহ্ন আছে অনুতাপ, আনন্দ-গৌরব!
এবে মোর বাকী আছে কেবলি মরিতে!
এস হৃদয়ের মাঝে হৃদয়ের ধন!
মরিব মনের সাধে, হেরি ও চরণ।

শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

রামচন্দ্র ও জাবালিমুনির কথোপকথন।

যখন দশরথ-তনয় মহামতি রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন, সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতা-দেবীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে 'চিত্রকূট' পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার নানা ফল ফুল বৃক্ষ লতা-সম্পন্ন পার্ব্বতীয় শোভাপূর্ণ ও অনেক প্রকার পক্ষি-কুল-কাকলিত রমণীয় 'চিত্রকূটের' সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করতঃ সদা

সর্ব্বদা যতীব্রতী পরমজ্ঞানী মুনিঋষিগণের সহবাসে নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করিবার অবসর পাইতেন না। একদিন প্রাতঃকালে প্রভাতীয় শীতল বায়ু পার্ব্বতীয় বনলতা কম্পিত করিয়া মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসিয়া নিজ নিজ সুকণ্ঠধ্বনিতে বনস্থলী ঝঙ্কারিত ও মুখরিত করিতেছে, পূর্ব্বাকাশে বালরবি উদিত হইয়া গাছের পাতার মধ্যে দিয়া উকিঝুঁকি মারিতেছে। অনন্ত নীলাকাশ উজ্জ্বল কাচখণ্ডবৎ শোভমান হইয়াছে। চিত্রকূটের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর, পবিত্রচেতা রামচন্দ্রের হৃদয়ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া ঋষিগণের সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে কথা প্রসঙ্গে মুনিবর জাবালি শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অহে রাম! তুমি এত বুদ্ধিবিশারদ ও গুণসম্পন্ন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় বিমাতার অভিসন্ধি জ্ঞাত হইয়াও তোমার পিতৃবাক্য প্রতিপালনে তৎপর হইয়াছ কেন? এ সংসারে কেহ কাহারও নহে; পিতা মাতা পুত্র কন্যা সব সম্বন্ধই মিথ্যা। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করিয়া একাকীই লয়প্রাপ্ত হয়, অতএব যাহারা পিতা মাতা সম্বন্ধ বন্ধনপূর্ব্বক মোহেতে পতিত হয়, তাহাদিগকে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও উন্মত্ত জ্ঞান কর। যেমন কোন লোক কোন স্থানে গিয়া সেখানে থাকিবার জন্য একটি গৃহ পাইল এবং সেখানে একদিন বাস করিয়া পুনরায় অন্যত্র চলিয়া গেল, সেইরূপই এ সংসারে পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন জন অট্টালিকা এই সমুদয়ই অল্পবাস করিবার স্থান মাত্র। হে মহামতে! সাধুব্যক্তিরা এ সকল বিষয়ে আসক্ত হয়েন না। তোমার এমন ধনশালী নগরী ও পিতার রাজ্য গৃহ পরিজন দাস দাসী পরিপূর্ণ অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ কষ্ট পরিপূর্ণ বনে আগমন করা কখনই উচিত হয় নাই। তুমি এই সকল কষ্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরাজ্য অযোধ্যাতে গিয়া সুখে রাজ্যপালন কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন এবং তুমিও তাঁহার কেহ নহ; আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর। পিতা মাতা শুধু জীবনের হেতু মাত্র। সৃষ্টির সংযোগের নিয়ম অনুসারে জীবের জন্ম হয়। সেই সত্যবদ্ধ নৃপতি যেখানে গিয়াছেন, তুমিও সেখানে যাইবে, এক্ষণে তোমার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ? জগতের স্বভাবই এই। কিন্তু তুমি পুরুষ হইয়া ভোগে এরূপ স্পৃহাহীন কেন? যাহারা ইহকালের রাজ্য সম্পদ বিভবাদি উপস্থিত ভোগ্য পরিত্যাগ করিয়া পরলোকের অনুপস্থিত পুণ্যফল গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহাদের জন্য দুঃখ করি; যেহেতু ইহজীবনে কষ্ট করিয়া মৃত্যুর পর ইচ্ছামত ধর্ম্মফল পাওয়া যায় না। এই যে লোকে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি দান করিতে উদ্যত হয়, সে কেবল নিজ ভোগসাধনের অপচয় হেতু। যে মরিয়াছে সে কি করিয়া

আহার করিবে? একজনের ভুক্ত অন্ন অন্যের উদরে যাইতে পারে না। যদি এইরূপই হইত, তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে দান করিলে তাহার পাথেয় হইতে পারিত! দেবপূজা, অন্নদান, যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্ন্যাস গ্রহণ এ সকলই দানের বশীকরণ উপায় স্বরূপ। বেদাগমাদি গ্রন্থে মেধাবী ধূর্ত্তগণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনের জন্য এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। অতএব এই জগতের পরে আর কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই। তুমি নিজে জ্ঞানী, বিচার করিয়া কার্য্য কর। প্রত্যক্ষ ত্যাগ করিয়া পরোক্ষে ধাবিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে।"

মহর্ষি জাবালির মুখ হইতে এইরূপ বাক্য নিঃসৃত হইলে পর ধীমান্ রামচন্দ্র মুনিবাক্যের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিলেন ও যুক্তিসঙ্গত বচন দ্বারা কহিলেন "আপনি আমার মঙ্গলকামনা করিয়া এক্ষণে যাহা বলিলেন, তাহা করণীয় হইলেও এ সময় কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু অসাধু পাপসংস্পৃষ্ট অসদাচারী ব্যক্তি, পবিত্র সহবাস ও শুদ্ধচেতা ব্যক্তিদিগের নিকটে সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য গুণসম্পন্ন, পবিত্র ও বলিষ্ঠ ইত্যাদি হউক অথবা না হউক, তাহার স্বভাবই তাহাকে প্রসিদ্ধি লাভ করাইয়া দেয়। নির্গুণ মনুষ্য গুণসম্পন্নের ন্যায়, অপবিত্র পবিত্রের ন্যায়, দুর্ব্বল বলিষ্ঠের ন্যায় ভাণ করিলে যেমন হয়, সেই প্রকার আমিও যদি ধর্ম্মবিরত হইয়া আপনার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমার অধর্ম্ম হইবে ও অধর্ম্মজনিত অমঙ্গল প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই। এরূপ নীচাশয় বুদ্ধিবিবেকহীন হইলে কোন্ জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা করিবে? আমি আপনার শিক্ষানুসারে পিতার সত্যপালনে বিমুখ হইয়া কোন্ মহাত্মা ব্যক্তির প্রীতিকর হইব? ও কিরূপেই বা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইব? আমি যদি আপনার উপদেশ মত স্বেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে সমস্ত লোকেই যে আমার অনুরূপ কার্য্য করিবে কারণ রাজারা যাহা করেন, প্রজারাও সেই নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। সনাতন রাজধর্ম্মের নিয়মই এই যে সত্য বাক্য বলা ও সত্যেরই নিয়ম পালন করা। রাজ্য ধন যাহাই বলুন না কেন, সমস্তই সত্যের উপর নির্ভর করে। স্বর্গবাসী মর্ত্ত্যবাসী সকলেই সত্যকে পূজা করেন। পৃথিবীতে যিনি সত্যবাদী হন, তিনিই পরে স্বর্গ ও অনেক পুণ্যলাভ করেন। লোকে ক্রূরমতি সর্পকে দেখিলে যেমন ভয় করে, মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে দেখিলেও সেইরূপ শঙ্কান্বিত হয়, অতএব সত্যের মত আর কোন ধর্ম্ম নাই। সংসারে সত্য ধর্ম্মের মত আর কোন ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীতে সত্যই সমস্ত ধর্ম্মের মূল, পরমেশ্বর সত্যপদবাচ্য। দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা ইত্যাদি যে সকল বেদে লিখিত আছে, সেই বেদ সত্যেই স্থাপিত রহিয়াছে, অতএব মনুষ্য মাত্রেই

সত্য পরায়ণ হইবে। মানুষ একাকীই রাজ্য করে, একাই বংশ রক্ষা করে, একাই নরকে যায় এবং একাই স্বর্গবাসী হয়। আমি আমার সত্যপরায়ণ পিতার সত্য রক্ষা করিতে কেন বিমুখ হইব? পিতার আজ্ঞাপালন করিতে কেন অবহেলা করিব? আমি সত্যধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়াও কি তদনুসারে কার্য্য করিব না? আমি যখন পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন লোভ ও মোহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সত্য বাক্যের কি অবমাননা করিব? মনুষ্যগণের পক্ষে সত্যপালন ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমাদের প্রাচীন কালের লোকেরাও জটাবল্কল পরিধান করিতেন, সেই জন্য আমিও সেইরূপ বিষয়ে নিযুক্ত হইতেছি। মন্দমতি দুরাচার পাপীলোকদিগের ন্যায় কি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব? এবং আমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিব না? পাপ তিন প্রকার:—প্রথম মানসিক পাপ, দ্বিতীয় তাহাই কার্য্যে পরিণত করা, তৃতীয় লোকের নিকট মিথ্যা কথা বলা। মনে ভাবা, কাজে করা এবং মুখে বলা তিনই পাপ। সত্যপরায়ণ পুরুষের প্রতি যশ, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, এজন্য সত্যেরই সেবা করা উচিত। আপনি আমাকে যাহা উপদেশ দিয়া "রাজ্যপালন কর" ইত্যাদি হিতকর বাক্য বলিলেন, আমার নিকট তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমি পিতার নিকট "বনবাস করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন তাহার অন্যথাচরণ-দ্বারা কি প্রকারে সত্য রক্ষা করিব? এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমাতা কৈকেয়ী-দেবীর মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল, তাঁহার মনে কেন ক্লেশ দিব? অতএব আমি এক্ষণে পবিত্র চিত্তে ফলমূল ও পুষ্প-দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা করতঃ, এবং স্বয়ং ফলমূলাহারী হইয়া দেহ ধারণ পূর্ব্বক নিজ প্রতিজ্ঞা ও পিতার সত্য-পালন করিব। এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। দেবতারাও শত শত যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক এবং মুনিঋষিরাও কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন এবং আমি পিতৃসত্য পালন করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিব।"

মহাপরাক্রম রাজকুমার রামচন্দ্র জাবালিমুনির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যের পুনর্ব্বার নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন "সত্যবাদিতা, সর্ব্বজীবে দয়া, তপস্যা ও অতিথিসৎকার দ্বারাই মহাত্মাগণ স্বর্গের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি আমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। চোর যেমন শাস্তি পাইবার পাত্র, নাস্তিক মনুষ্যও সেইরূপ দণ্ড পাইবার উপযুক্ত এবং রাজারও কর্ত্তব্য প্রজাগণের বুদ্ধি পরিস্ফুটন জন্য নাস্তিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া। ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, দানরত উন্নতচেতা, হিংসাশূন্য প্রভৃতি লোকেরাই

লোকসমাজে আদৃত ও পূজিত হন। আপনার ন্যায় নাস্তিক মতাবলম্বী মুনিগণ কখনও সম্মানপাত্র নহেন।”

মহাত্মা রামচন্দ্রের এইরূপ সৎযুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর জাবালি আবার ন্যায়যুক্ত ও সত্যবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন “আমি তোমাকে নাস্তিক হইতে বলিতেছি না এবং আমিও স্বয়ং নাস্তিক নহি, আমি কেবল তোমাকে পরীক্ষা ও বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছি। তুমি সাধু সাধু।”

শ্রীশশিমুখী দেবী।

ভবিষ্যৎ।

আঁধারিয়া সারা বিশ্ব হৃদয়ে আমার
জাগিছে রে ভবিষ্যের ছায়া,
কেহ নাই—কিছু নাই—শুধু হাহাকার,
শুধু কিরে স্বপ্নাবেশ ! শুধু কিরে মায়া ?
এমনি কি সারাদিন হাসিবে তপন ?
এমনি কি ফুটিবেরে ফুল ?
এমনি কি বহিবেরে মৃদুল পবন
বিশ্বজনে করিতে আকুল ?
এমনি কি প্রতিদিন জাগিয়া সকলে
যে যাহার কাজেতে লাগিবে,
সন্ধ্যাশেষে ক্লান্ত দেহে ফিরে দলে দলে
সবাই কি বিশ্রাম মাগিবে ?
হাসিবে কি নীলাকাশে তারকার দল ?
পাপিয়া কি গাহিবে গো গীতি ?
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে প্রাণ করিয়া বিহ্বল
জাগিবে কি অতীতের স্মৃতি ?
তরঙ্গের কলধ্বনি, বসন্তের বায়,
যৌবনের সুখের স্বপন,
তখনো কি ধরামাঝে রহিবে গো হায় !
আমিও রহিব সচেতন ?
হৃদয়ের চিন্তা আর নয়নের জল,
পরাণের গভীর উচ্ছ্বাস,
রবে কি গো ভয়, দুঃখ, শত কোলাহল,
বুকে কি বহিবে দীর্ঘশ্বাস ?
সেই প্রাণ, সেই দেহ, সেই আশা, তৃষা,
সবি যদি বেঁচে থাকে হায় !
তবে কেন হৃদে আসে শতেক নিরাশা,
কেন অশ্রু নয়নে গড়ায় ?
দাও নাথ ! নববল হৃদয়ে আমার,
বিশ্বে হেরি তোমার আলোক,
আমি দীন ছুটে যাই ভবিষ্যের পানে,
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।

কুমারী সুকুমারী দাস।

বিসর্জ্জন।

(৪৩৮ সংখ্যা—৮৪ পৃষ্ঠার পর)।

সুধাময়ীও মার বক্ষ চূর্ণ করিয়া অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল, উমাও শয্যা লইল। সে কন্যাকে শমনের ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। এইবার সে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিল। একসন্ধ্যায় একবার মাত্র আহারে বসিত। প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আহ্নিক পূজা করিত। তারপর বৈকালে স্বহস্তে আতপ তণ্ডুল, আলু, কিম্বা অন্য কিছু সেই সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাইত। ফের সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাহ্নিকে বসিত, তাহার পর হরিনামের মালা লইয়া সহস্র বার হরির নাম করিত। গভীর রাত্রেও বসিয়া ভগবদ্গীতা বা মহাভারত পাঠ করিত। বিধবা হইবার পর সে পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত কথা কহে নাই বা অন্য কাহাকেও মুখ দেখায় নাই। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে ভগ্নীপতিকে দেখিয়া মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। কিন্তু মানবের দেহে কত সহিবে? একে সে শৈশব হইতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণাঙ্গী ছিল, তাহার পর এই দারুণ শোক ও অত্যাচারে সে শরীরে কত সহিবে? প্রথমে তাহার অল্প অল্প জ্বর ও কাশী আরম্ভ হইল। বিধবার আবার জ্বর, সে এই ভাবিয়া জ্বর লুকাইয়া রাখিয়া নিয়মিত স্নানাদি করিয়া পূজাহ্নিক করিত। ক্রমে জ্বর বাড়িয়া তাহাকে শয্যাশায়িনী করিল। তখন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "এ ক্ষয়রোগ, ফুসফুসে ঘা হইয়াছে।" তবু চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু সে ঔষধ খাইত না—বলিত "আমার আবার বাঁচনের সাধ আছে নাকি।"

কেহ কেহ বুঝাইয়া বলিলেন "তা হ'লে আত্মহত্যা করিলে যে মহাপাপ হবে।"

তখন সে মহাপাপের ভয়ে ঔষধ খাইতে আরম্ভ করিল। সেই শয্যায় পড়িয়াও কত বিচার। ব্রাহ্মণে অন্ন পাক করিয়া দিত, গঙ্গাজলে রান্না হইত। দুগ্ধও ব্রাহ্মণে আনিয়া দিলে খাইত। সেই দুর্ব্বল শরীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া তসর কাপড় পরিধান করিয়া তবে আহারে বসিত। সেই দীর্ঘকালব্যাপী রোগে মৃত্যু একবার যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই জানে তাহা কি ভীষণ। যার মৃত্যু হইবে সে পলে পলে জানিতেছে আমায় মরিতে হইবে। ইংরাজীতে আছে (death by inches), বাঙ্গলায় ইহাকেই পলে পলে মৃত্যু বলিতেছি।

সেই দারুণ রোগের যন্ত্রণা, তাহার উপর একাদশীতে যম-যন্ত্রণা। সেই বৈশাখ মাসের একাদশীতে একদিন সে

অর গায়ে ধূলায় লুটাইতেছিল, তথন তাহার একজন অতি নিকট আত্মীয়া রমণী বলিলেন—

"উমা! আমার কথা রাখ ভাই, একটু জল খাও।"

সে কাতর ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—

"না ভাই জল কোন মতে খাব না; আমি ত শীঘ্রই মরিব, আর মরণ কালে কেন পাপে ডুবিয়া স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হইব?"

"এতে আর অবিশ্বাসিনী কেন হবে? আমার কথা শুনে খাও, আমার দিব্য খাও।"

"যথন সেই প্রাণহইতে প্রিয় যে স্বামী, তাঁহার অদর্শন সহিয়া আছি, তথন আর এ যাতনা সহিতে পারিব না? তুমি জল খাবার কথা বলো না, একাদশীর দিনে বিধবাকে যে জল খেতে বলে তার পাপের সীমা নাই।"

"আমি পাপ পুণ্য মানি না, এই গঙ্গাজল হাতে করিয়া দিতেছি, যা পাপ হবে সব আমার। তুমি এই জলটুকু খাও।"

"না ভাই স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হতে পার্ব্ব না, তিনি কত যন্ত্রণা পেয়ে গিয়েছেন আর আমি একটু সহিতে পার্ব্ব না। কত পাপে এ জন্মে বিধবা হ'য়েছি, আর এ জন্মে পাপের বোঝা বাড়াতে পারি না। একাদশীতে মুখে কিছু দিলে জন্ম জন্ম বিধবা হইতে হয়।"

এ কথায় আর কে তাহাকে বুঝাইবে? কেইবা তাহার ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সে পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই খাইত না! ফলের সময় কোন ফলই খাইত না, বাজারের কোন মিষ্টান্ন কথন মুখে দেয় নাই। কারণ সে সব স্বামী ভালবাসিতেন, সুধা ভালবাসিত।

মৃত্যুর পাঁচ দিবস পূর্ব্বেও সে নির্জ্জলা একাদশী করিয়াছে। তথন সে শয্যা হইতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না। হস্ত পদ আপনি নাড়িতে পারিত না। ভোর বেলা তাহার আত্মীয়া রমণী তাহাকে জল খাওয়াইতে গেলে সে বলিত—

"আগে জানালা খোল, দেখি ভোর হ'য়েছে কি না।

তথন অল্প অন্ধকারের ঘোর ছিল, সে সম্পূর্ণরূপে আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত মুখে জল দিল না।

মঙ্গলবার প্রভাতে সে দিব্য কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বুঝিল আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ আসিয়া দেখিয়া তাহার পিতাকে বলিলেন "নাড়ীর গতি ভাল নহে, এলো মেলো হয়েছে।" সে দিন সে অল্প আহারও করিল। কিন্তু সারাদিন অতিশয় অস্থির হইয়া কেবল এপাশ ওপাশ করাইতে বলিল, পরে বেলা ৪টার সময় কাতর কণ্ঠে বলিল—

"দিদি! আমার প্রাণের ভিতর এমন কচ্ছে কেন? আমি কি ভাই আজ মরিব?"

যাঁহাকে সেই প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার

সে সময়ের ভাব অবর্ণনীয়! তবে যদি কেহ আপনার প্রিয় জনের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া জীবন শেষ হইতে দেখেন, তাহা হইলে তিনিই বুঝিবেন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি ভীষণ! তবু বলিলেন—

"উমা! অমন কোরো না ভাই, হরিনাম কর, প্রাণের ভিতর যা কষ্ট হচ্ছে তাঁরি নামে দূর হবে!"

সে ব্যগ্র হইয়া হরিনামের মালা চাহিল, নামাবলী গায়ে ঢাকা দিতে বলিল, গঙ্গাজলে মুখ হাত ধোয়াইয়া দিতে বলিল, গঙ্গাজল মাথায় দিতে বলিল, তুলসী পত্র ও তুলসীতলার মৃত্তিকা আনিয়া ললাটে লেপন করিতে বলিল। তাহার পর সম্মুখের প্রাচীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাঁহাকে যোড় হাতে প্রণাম করিয়া সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে একমনে বলিতে লাগিল—

"হরি হরি, রাম রাম, সীতারাম, হরি হরি" সে কথার আর বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। একজন সেই সময়ে তাহার পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—

"উমা! তোমার বাবা এসেছেন।"

সে মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া চাহিল মাত্র. তাহার পর সুস্পষ্ট স্বরে কহিল—

"বাবা এসেছেন? কে কার, আমি কার? কেহ সঙ্গে যাইবে না, কেহ সঙ্গে আসে নাই। একাই আসিয়া একাই যাইতেছি, তোমরা সকলে মিলিয়া বল 'হরি হরি।"

সেই এক মনে, এক ধ্যানে হরির চরণ স্মরণ করিয়া হরিনাম গান গাহিতে গাহিতে, সেই হরিনামাবলী গাত্রে দিয়া, হরিনামের মালা হাতে ধরিয়া অভাগিনী কন্যা শোকে কাতরা বিধবা সন্তানে হরির বৈকুণ্ঠ লোকে চলিয়া গেল। সেই দগ্ধ প্রাণ শান্তি লভিল। এখনও আমার মানস চক্ষে সেই দৃশ্য জীবন্তভাবে জাগিয়া আছে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। বিধবা হইয়া সে বৎসর খানেক এই পৃথিবীতে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। তাহার ব্রত পূর্ণ হইলে সে অমরধামে পতি দেবতার চরণোদ্দেশে চলিয়া গেল। ঈশ্বর তাহাদের দুঃখময় তাপিত আত্মাদ্বয়কে সম্মিলিত করিয়া চিরশীতল করুন্ এই প্রার্থনা।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

মহদ্বাক্য।

১। ধর্ম্মপুরীর প্রবেশ দ্বারে লেখা আছে, "সকলে এস।" উহার অন্তঃপুরের প্রাচীরে লেখা আছে, "যাহাই চাহিবে, তাহাই পাইবে।"

২। যদি অন্তরের পবিত্রতা না থাকে, তাহা হইলে শত সৎকার্য্যেও তোমার মুক্তি নাই।

৩। ধান্য পাকিলে যেমন গাছ

জর গায়ে ধুলায় লুটাইতেছিল, তখন তাহার একজন অতি নিকট আত্মীয়া রমণী বলিলেন—

"উমা! আমার কথা রাখ ভাই, একটু জল খাও।"

সে কাতর ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—

"না ভাই জল কোন মতে খাব না; আমি ত শীঘ্রই মরিব, আর মরণ কালে কেন পাপে ডুবিয়া স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হইব?"

"এতে আর অবিশ্বাসিনী কেন হবে? আমার কথা শুনে খাও, আমার দিব্য খাও।"

"যখন সেই প্রাণহইতে প্রিয় যে স্বামী, তাঁহার অদর্শন সহিয়া আছি, তখন আর এ যাতনা সহিতে পারিব না? তুমি জল খাবার কথা বলো না, একাদশীর দিনে বিধবাকে যে জল খেতে বলে তার পাপের সীমা নাই।"

"আমি পাপ পুণ্য মানি না, এই গঙ্গাজল হাতে করিয়া দিতেছি, যা পাপ হবে সব আমার। তুমি এই জলটুকু খাও।"

"না ভাই স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হতে পার্ব্ব না, তিনি কত যন্ত্রণা পেয়ে গিয়েছেন আর আমি একটু সহিতে পার্ব্ব না। কত পাপে এ জন্মে বিধবা হ'য়েছি, আর এ জন্মে পাপের বোঝা বাড়াতে পারি না। একাদশীতে মুখে কিছু দিলে জন্ম জন্ম বিধবা হইতে হয়।"

এ কথায় আর কে তাহাকে বুঝাইবে? কেইবা তাহার ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সে পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই খাইত না! ফলের সময় কোন ফলই খাইত না, বাজারের কোন মিষ্টান্ন কখন মুখে দেয় নাই। কারণ সে সব স্বামী ভালবাসিতেন, সুধা ভালবাসিত।

মৃত্যুর পাঁচ দিবস পূর্ব্বেও সে নির্জ্জলা একাদশী করিয়াছে। তখন সে শয্যা হইতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না। হস্ত পদ আপনি নাড়িতে পারিত না। ভোর বেলা তাহার আত্মীয়া রমণী তাহাকে জল খাওয়াইতে গেলে সে বলিত—

"আগে জানালা খোল, দেখি ভোর হ'য়েছে কি না।

তখন অল্প অন্ধকারের ঘোর ছিল, সে সম্পূর্ণরূপে আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত মুখে জল দিল না।

মঙ্গলবার প্রভাতে সে দিব্য কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বুঝিল আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ আসিয়া দেখিয়া তাহার পিতাকে বলিলেন "নাড়ীর গতি ভাল নহে, এলো মেলো হয়েছে।" সে দিন সে অল্প আহারও করিল। কিন্তু সারাদিন অতিশয় অস্থির হইয়া কেবল এপাশ ওপাশ করাইতে বলিল, পরে বেলা ৪টার সময় কাতর কণ্ঠে বলিল—

"দিদি! আমার প্রাণের ভিতর এমন কচ্চে কেন? আমি কি ভাই আজ মরিব?"

যাঁহাকে সেই প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার

সে সময়ের ভাব অবর্ণনীয়! তবে যদি কেহ আপনার প্রিয় জনের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া জীবন শেষ হইতে দেখেন, তাহা হইলে তিনিই বুঝিবেন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি ভীষণ! তবু বলিলেন—

"উমা! অমন কোরো না ভাই, হরিনাম কর, প্রাণের ভিতর যা কষ্ট হচ্চে তাঁরি নামে দূর হবে!"

সে ব্যগ্র হইয়া হরিনামের মালা চাহিল, নামাবলী গায়ে ঢাকা দিতে বলিল, গঙ্গাজলে মুখ হাত ধোয়াইয়া দিতে বলিল, গঙ্গাজল মাথায় দিতে বলিল, তুলসী পত্র ও তুলসীতলার মৃত্তিকা আনিয়া ললাটে লেপন করিতে বলিল। তাহার পর সম্মুখের প্রাচীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাঁহাকে যোড় হাতে প্রণাম করিয়া সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে একমনে বলিতে লাগিল—

"হরি হরি, রাম রাম, সীতারাম, হরি হরি" সে কথার আর বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। একজন সেই সময়ে তাহার পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—

"উমা! তোমার বাবা এসেছেন।"

সে মুহূর্ত্তের জন্ত ফিরিয়া চাহিল মাত্র. তাহার পর সুস্পষ্ট স্বরে কহিল—

"বাবা এসেছেন? কে কার, আমি কার? কেহ সঙ্গে যাইবে না, কেহ সঙ্গে আসে নাই। একাই আসিয়া একাই যাইতেছি, তোমরা সকলে মিলিয়া বল 'হরি হরি।"

সেই এক মনে, এক ধ্যানে হরির চরণ স্মরণ করিয়া হরিনাম গান গাহিতে গাহিতে, সেই হরিনামাবলী গাত্রে দিয়া, হরিনামের মালা হাতে ধরিয়া অভাগিনী কন্যা শোকে কাতরা বিধবা সজ্ঞানে হরির বৈকুণ্ঠ লোকে চলিয়া গেল। সেই দগ্ধ প্রাণ শান্তি লভিল। এখনও আমার মানস চক্ষে সেই দৃশ্য জীবন্তভাবে জাগিয়া আছে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। বিধবা হইয়া সে বৎসর খানেক এই পৃথিবীতে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। তাহার ব্রত পূর্ণ হইলে সে অমরধামে পতি দেবতার চরণোদ্দেশে চলিয়া গেল। ঈশ্বর তাহাদের দুঃখময় তাপিত আত্মাদ্বয়কে সম্মিলিত করিয়া চিরশীতল করুন্ এই প্রার্থনা।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

মহদ্বাক্য।

১। ধর্ম্মপুরীর প্রবেশ দ্বারে লেখা আছে, "সকলে এস।" উহার অন্তঃপুরের প্রাচীরে লেখা আছে, "যাহাই চাহিবে, তাহাই পাইবে।"

২। যদি অন্তরের পবিত্রতা না থাকে, তাহা হইলে শত সৎকার্য্যেও তোমার মুক্তি নাই।

৩। ধান্য পাকিলে যেমন গাছ

অবনত হইয়া পড়ে; জ্ঞান পরিপক্ক হইলে তেমনি মানুষ নম্র হয়।

৪। যাঁহারা তোমার শত্রু, তুমি ভাবিতেছ আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। কিন্তু তোমার বন্ধুবর্গের কথা উত্থাপিত হইলে তোমার মুখে যে আনন্দের, যে সদ্ভাবের, যে সহানুভূতির চিত্র দেখিতে পাই, তোমার অহিতকারী ব্যক্তিদিগের নাম করিলে তোমার সে ভাব ত দেখিতে পাই না! প্রকৃত ক্ষমা অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে।

৫। নম্রতা ও দীনতা ধর্ম্মোন্নতির বীজ, কেননা নম্র ভাবে দীন ভাবে ঈশ্বরের নিকট, সাধুগণের নিকট উপস্থিত হইতে না শিখিলে ধর্ম্মসাধনের সম্ভাবনা নাই।

৬। আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য তাঁহারই নিকট হইতে শিখিও, যিনি ভগবান্‌কে ভয় করেন ও ভক্তি করেন; যিনি ভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব লইয়াই মস্তিষ্ক বিলোড়নে সদাই প্রবৃত্ত, তিনি এ বিষয়ে তোমার প্রকৃত শিক্ষাদাতা হইবার উপযুক্ত নহেন।

৭। কাহাকেও অসুখী করিয়া নিজের সুখলাভে সচেষ্ট হইও না।

৮। তাহার সত্তা মাত্র আছে জীবন নাই, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াও জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ হইতে পারে নাই।

৯। ইন্দ্রিয়-সংযমঃদ্বারাই আত্মা বলীয়ান হয়।

১০। বন্ধুতার অর্থই এই যে উভয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করা। তোমার যে সদ্‌গুণ আছে, তাহা যদি তোমার বন্ধুতে তুমি সঞ্চারিত না করিতে পারিলে, তাহা হইলে বন্ধুত্ব কোথায়?

১১। যে ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিলে তাহার সহগামী যাতনাও পরিত্যাগ করা হয়, সে ভোগ-সুখ যিনি বর্জ্জন করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। (ক্রমশঃ)।

ধ্যান।

শরশয্যায় ভীষ্ম।

শরতল্পে মহাবীরঃ স্থিতো নিপতিতো রণে।
ধরণীং নৈব পস্পর্শ শরসঙ্ঘৈঃ সমাচিতঃ ॥
কালাগ্নিসদৃশৈর্ঘোরৈঃ শরৈর্গাণ্ডীবধন্বনঃ।
দহ্যমানোঽপি শুশুভে প্রফুল্লমুখপঙ্কজঃ ॥
বাণৈর্বিদীর্ণমর্ম্মাপি ছিন্ননাড়ীচয়োঽপি চ।
অম্লানকান্তিরক্ষুব্ধহৃদয়ঃ স নরর্ষভঃ ॥
স্রবদ্রুধিরধারাভিররুণাঙ্গো মহাদ্যুতিঃ।
রক্তবর্ণ ইবাদিত্যঃ সায়মস্তাচলোন্মুখঃ ॥

মহাশান্তিময়ে যোগে মগ্নো নিশ্চললোচনঃ।
সুপ্রশান্তোঽতিগম্ভীরো নিস্তরঙ্গ ইবাম্বুধিঃ ॥
বৈরাহতোঽত্যধর্ম্মেণ রণে পার্থাদিবৈরিভিঃ।
তানেবাহূয় সস্নেহং স্বাগতেনাভিনন্দ্য চ ॥
শ্রাবয়ত্যতিযত্নেন কথাং শান্তিসুধাময়ীম্।
শিবাং মৃত্যুব্যথারোগশোকমোহনিবারিণীম্ ॥
দ্বৈপায়নাদিমুনিভিঃ কৃষ্ণপাণ্ডবকৌরবৈঃ।
নিঃশব্দবদনৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥

মহাবিস্ময়সম্ভ্রাঃ সিদ্ধবৃন্দারকাস্তদা।
শরতল্পগতং বীরং পুষ্পবর্ষৈরবাকিরন্॥
ধন্যোঽসি দেবব্রত হে ভীষ্ম পাণ্ডকিতারণ।
ধন্যোঽসি ধন্যোঽসি ভবে বীর শান্তনুনন্দন॥
ত্বয়া জ্ঞানামৃতং দত্তং শরশয্যাগতেন যৎ।
তদক্ষয়মনন্তঞ্চ জীবলোকস্য মঙ্গলম্॥
মুমূর্ষুণাপি বার্দ্ধক্যে যদ্বীর্য্যং দ্যোতিতং ত্বয়া।
নিরাকরোতি তত্তেজঃ কোটিশোঽপি প্রভাকরান্॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে চৈব সত্যস্য পরিপালনে।
ন ভবৎপ্রতিমো বীরঃ শ্রূয়তে ভুবনত্রয়ে॥
মৃত্যুঞ্জয়ো বিশ্বজয়ী কৃপাধারঃ ক্ষমানিধিঃ।
ন দৃষ্টো ন শ্রুতঃ কাপি সর্ব্বত্যাগী ভবাদৃশঃ॥
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদানেন ত্বং গুরুর্যোগিনামপি।
জ্ঞানকল্পতরুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ॥
সমস্তং ভুবনং ধন্যং মহিম্না তব ভারত।
ভীষ্মদেব মহাদেব নমামি চরণৌ তব॥
জীবলোকং পরিত্রাতুং শান্তিদানেন সর্ব্বতঃ।
স্বয়মঙ্গীকৃতা দেব শরশয্যা ত্বয়া রণে॥
ভক্ত্যা ধ্যায়তি যো মূর্ত্তিং শরতল্পগতাং তব।
শোকশল্যানলজ্বালা নূনং তস্য প্রশাম্যতি॥

(অনুবাদ)।

রয়েছে অসংখ্য বাণ সর্ব্বাঙ্গ বিদরি,
ভূমি না পরশে দেহ আছে শরোপরি। (১)
দহিছে কালাগ্নি সম পার্থ-শরানল,
তথাপি প্রফুল্ল তাঁর বদনকমল,
ছিন্ন ভিন্ন হৃদিপিণ্ড নাড়ী সমুদয়,
তথাপি অম্লান কান্তি, অক্ষুব্ধ হৃদয়;
প্রগাঢ় শোণিতে লিপ্ত শোভে কলেবর—
যেন অস্তাচলগামী লোহিত ভাস্কর।
মহাশান্তিময় যোগে আত্মা নিমগন,
প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, নিশ্চল লোচন;
গভীর তরঙ্গশূন্য সমুদ্র সমান,
অলক্ষ্যে অন্তরে উঠে প্রেমের তুফান!
যে পার্থ সর্ব্বাঙ্গ তাঁর বজ্রসম শরে—
বিন্ধিল অধর্ম্ম করি' অন্যায় সমরে, (২)
সেই পার্থ আদি যত ঘোর শত্রুগণে
কাছে ডাকি' সম্ভাষেন মধুর বচনে, (৩)

(১) অর্জ্জুন সাংঘাতিক শরনিকরে ভীষ্মকে এরূপ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম-দেহে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অক্ষত ছিল না; "ন তস্যাসীদনির্ভিন্নংগাত্রে দ্ব্যঙ্গুলমন্তরম্" (মহাভারত)। এক একটী প্রকাণ্ড ভীষণ বাণ তাঁহার দেহের পুরোভাগ ভেদ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে বাহির হইয়া দেহে সংলগ্ন ছিল। এজন্য তাঁহার দেহ শরোপরি স্থাপিত ছিল, ভূমি স্পর্শ করে নাই। তাঁহার শিরোদেশ অক্ষত ও লম্বমান হওয়ায়, অর্জ্জুন তিনটী সুতীক্ষ্ণ মহাবাণে তাঁহার শিরোদেশ বিদীর্ণ করিয়া শরোপরি রক্ষিত করিয়াছিলেন।

(২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়গণের বধ ভয়ে ভীষ্ম সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। শত্রুসেনা নিবারণ পক্ষেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, এজন্য লঘু যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ভীষ্ম সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলে এক প্রাণীও জীবিত থাকিত না। তথাপি ভীষ্মকে অজেয় দেখিয়া অর্জ্জুনকে অধর্ম্ম-পথ আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। স্ত্রী ও নপুংসক প্রভৃতির উপর অস্ত্রক্ষেপ করা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী, কোনও যক্ষের প্রভাবে পুরুষরূপে প্রতিচ্ছন্ন ছিল, ভীষ্ম তাহা জানিতেন। তিনি প্রাণান্তেও শিখণ্ডীর উপর অস্ত্রক্ষেপ করিবেন না জানিয়া অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে নিজ রথের সম্মুখে বসাইয়া, অস্ত্রত্যাগী, যুদ্ধ-বিরত বৃদ্ধতম পিতামহের সর্ব্ব শরীর দিব্যাস্ত্রজালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে রথ হইতে পাতিত করেন।

(৩) শরশয্যায় পতিত হইয়াই ভীষ্ম কুরু-পাণ্ডবগণকে প্রেমময় মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—হে দেবোপম মহারথগণ! এ অনর্থকর সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হও। আমার জীবনের

শুনান তাদের শান্তিধর্ম্ম পুণ্য কথা,
যা শুনিলে যায় মোহ-শোক-মৃত্যু-ব্যথা।
কৃষ্ণ, ব্যাস আদি ঋষি, পাণ্ডব কৌরব—
শর-শয্যা-পার্শ্বে সবে বসিয়া নীরব।
হেরি তাঁরে চমকিত সুর-সিদ্ধগণে
বিছাইছে শরশয্যা পুষ্প বরিষণে।
ধন্য! ধন্য! ভীষ্মদেব! শান্তনু-নন্দন!
ধন্য! ধন্য! দেবব্রত! পাতকি-তারণ!
শরশয্যা মাঝে তুমি দিয়াছ যে জ্ঞান,
অনন্ত জীবের তাহা অক্ষয় কল্যাণ।
জরায় মুমূর্ষু কালে যে বীর্য্য তোমারি!
কোটি সূর্য্য হারি মানে প্রভাবে তাহার।
ইন্দ্রিয় সংযম আর সত্যের রক্ষণে—
তুলনা মিলেনা তব এ তিন ভুবনে। (৪)

তোমা হেন সর্ব্বত্যাগী কে আছে সংসারে?
এত ধৈর্য্য এত ক্ষমা কে দেখাতে পারে?
সর্ব্বজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়, দয়ার আধার, (৫)
হেন বীর কে দেখেছে কে শুনেছে আর?
ব্রহ্ম-বিদ্যা দানে তুমি যোগিকুল-গুরু, (৬)
সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা তুমি জ্ঞান-কল্পতরু।
সমগ্র ভুবন পূর্ণ তব মহিমায়,
ভীষ্মদেব! মহাদেব! নমি তব পায়।
শান্তিদানে জীবলোক করিতে নিস্তার,
আপনি এ শর-শয্যা করিলে স্বীকার।
শরশয্যা-মূর্ত্তি তব যে করিবে ধ্যান,
শোক-শল্য-জ্বালা তার হইবে নির্ব্বাণ।

সঙ্গেই এ যুদ্ধের অবসান হউক, আমার রক্তেই এ বৈরানল নির্ব্বাণ হউক। তোমাদের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপিত হউক। ভীষ্মদেবের শান্তি-ধর্ম্ম-কথা ধর্ম্ম-জগতের অক্ষয় ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

(৪) ভীষ্ম-পিতা শান্তনু সত্যবতী নাম্নী রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করায়, সত্যবতী বলিলেন, আমার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে যদি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, তবে আপনাকে বিবাহ করিব। কিন্তু সর্ব্বগুণাকর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্ম থাকিতে তাহা অসম্ভব বলিয়া শান্তনু হতাশ হইয়া গৃহে আসিলেন। তদবধি সত্যবতী-কামনায় তাঁহার শরীর ও মন অতিমাত্র অসুস্থ হইতে লাগিল। পিতৃভক্ত ভীষ্ম বহু অনুসন্ধানে পিতার মনোদুঃখের কারণ অবগত হইয়া, সত্যবতীর নিকট গিয়া বলিলেন, মা! আপনি আমার পিতাকে বিবাহ করুন, আপনার গর্ভের সন্তানই রাজ্যাধিকারী হইবে, আমি রাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে যদি আমার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্যপ্রার্থী হয়, এজন্য আমি বিবাহ করিব না, আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। অনন্তর তিনি সত্যবতীর সহিত বিবাহ দিয়া, পিতার মনোদুঃখ নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম আমরণ অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৫) পিতার বরে এবং যোগবলে ভীষ্ম 'মৃত্যুঞ্জয়' অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন।

(৬) যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের পতন শ্রবণমাত্র সমস্ত দেবলোক এবং যোগী ঋষি নৃপতি প্রভৃতি সকলে হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অয়ং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো হ্যয়ং ব্রহ্মবিদাং গতিঃ।..."হাহেতি দিবি দেবানাং পার্থিবানাং চ ভারত। পতমানে রথাদ্ ভীষ্মে বভূব সুমহাস্বনঃ॥" (মহাভারত) —এই ভীষ্মই ব্রহ্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞগণের উপজীব্য ছিলেন।

নবনীত বৃক্ষ।

গ্রন্থ বিশেষে বর্ণিত আছে যে, মানবের আদি পুরুষ আদম প্যারেডাইস্ বা নন্দন-কানন হইতে তিনটী বৃক্ষ পৃথিবীতে আনয়ন করেন—খর্জ্জুর, গোধূম বা গম এবং মার্টেল—বিলাতী মেদি। মতান্তরে তাল, সিন্দুর বৃক্ষ (oak) এবং আশ (ash) বৃক্ষ স্বর্গ হইতে আনীত বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। সেই জন্য এই শেষোক্ত তিনটী বৃক্ষকেই পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া অনেকে ভক্তি করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে বট, অশ্বথ ও তুলসী পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া পূজিত। যাহা হউক এই সকল বৃক্ষ আমাদিগের বিশেষ উপকারী, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে যে কত প্রকার আরও উপকারী ও আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারে? পথিকবন্ধু, গোপাদপ প্রভৃতির আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। নবনীত বৃক্ষ বলিয়া এক জাতীয় আশ্চর্য্য বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে জন্মিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার গুল্ম, ইহার বীজ হইতে উপাদেয় নবনীত (মাখন) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদ ঠিক্ মাখনের মত এবং অনেক দিন থাকিলেও বিকৃত বা বিস্বাদ হয় না। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে "মলন্‌কপ্ত বা অস্থালকি" বলে। বীজ হইতে শতকরা ১৭॥০ ভাগ পীত বর্ণের সুন্দর মাখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার গন্ধ ও স্বাদ উভয়ই মনোহর। ৩৫ হইতে ৫২ ডিগ্রী তাপে ইহা দ্রব হয় এবং ৩৩ ডিগ্রী তাপে চাপ বাঁধিয়া থাকে। চাপ মাখন অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ও সুস্বাদু থাকে। পরে অম্ল ও বিস্বাদ হইয়া পচিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে তদ্দেশীয়-দিগের ইহা প্রধান উপজীব্য।

পারস্য রাজ-কবি।

পারস্যের ভূতপূর্ব্ব সাহ আপনাকে কবি বলিয়া অভিমান করিতেন। একদা একটী কবিতা লিখিয়া রাজ-কবির হস্তে দিয়া তাঁহার মন্তব্য ব্যক্ত করিতে বলেন। কবি তাহা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, খোদাবন্দ, আমাকে ক্ষমা করিবেন ইহাতে কবিতার কোনও লক্ষণই নাই। সাহ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন "এই গাধাকে আস্তাবলে লইয়া যাও।" ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আস্তাবলে লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখিল। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে সাহ আর

একটী কবিতা রচনা করিয়া সেই কবির অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। কবি তাহা পাঠ করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র না বলিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন জন্য স্বদেশে গমন করিলেন। সাহ "কোথায় যাইতেছ?" বলিলে "পুনর্ব্বার আস্তাবলে যাইতেছি" বলিয়া কবি মৃদুভাবে উত্তর করিলেন। সাহ তখন নিজের মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন এবং কবির নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দানে প্রসন্ন করিলেন। ইহার পর তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, আর কখনও কবি হইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। যাঁহারা স্বভাব-কবি নহেন, তাঁহারা এই আখ্যায়িকাটী মনে রাখিলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। বেহিয়ার ওয়াল্‌টার টমস সাহেব মৃত্যুকালে ৯০০০ টাকা দান করেন। তাহার সুদে কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্রীদিগকে মাসিক ৭৷৷॰ টাকা হিসাবে ২ বৎসরের জন্য কয়েকটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। সাহেবের এরূপ দান অতীব প্রশংসনীয়।

২। ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাব, ৩৷৷॰ টাকা বার্ষিক সুদে এক কোটি টাকা কর্জ করিবেন।

৩। বিক্‌টোরিয়া স্মৃতিভাণ্ডারে ৩৫ লক্ষ টাকার অধিক জমিয়াছে। আরও সংগৃহীত হইতেছে। রাজা ৭ম এড্‌ওয়ার্ড ইহার জন্য মহারাণীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মূল্যবান্ ছবি সকল দান করিয়াছেন।

৪। আমেরিকায় এবার এত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে যে একদিনেই সর্দ্দি গরমীতে ২৫৬ জন মরিয়াছে। বহুসংখ্যক ঘোড়ার মৃত্যু হইয়াছে।

৫। সেন্সস্ বিভাগে ২০৲ টাকা বেতনে ফিরিঙ্গী বালিকারা কেরাণীর কার্য্য করিতেছেন।

৬। স্কুল আঃ ইনস্পেক্‌টর আবদুল করিম "আকবর ও তাঁহার সমসাময়িক বৃত্তান্ত" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া চৈতন্য লাইব্রেরী প্রদত্ত "উডবরণ স্বর্ণ-পদক" পাইয়াছেন।

৭। সুমতি-সমিতির কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিবরণ:—(১) সমিতির অন্তর্গত বনলতা লাইব্রেরীতে বাবু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, বাবু করুণাচন্দ্র সেন, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ও কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং রমণীমোহন মল্লিক ও শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী অনেকগুলি পুস্তক দান করিয়াছেন।

(২) সুমতি সমিতির দাতব্য বিভাগ হইতে দুইটী নিরাশ্রয় বালিকাকে কাপড় কিনিয়া দিবার সাহায্য করা হইবে।

(৩) বঙ্গরমণীদিগের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমিতি হইতে প্রতি বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫৲ টাকার একটী পারিতোষিক প্রদান করা হয়। যে কোন মহিলা নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন:—

প্রবন্ধের বিষয়—আদর্শ রমণী।

প্রবন্ধ আশ্বিন মাসের মধ্যেই ২৯ নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

৮। গত ২০এ জুলাই ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট-পত্নী বিবী ক্রুগারের মৃত্যু হইয়াছে।

৯। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক-পত্নী শ্রীমতী সাথিয়ানাধান তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন সর্ব্বপ্রথম "এম্ এ", সেইরূপ স্ত্রীলোকদের হিতার্থ একখানি ইরাজ মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া আপনার বিদ্যার সুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভারত মহিলাদের মুখ উজ্জ্বল হউক।

১০। কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রম সহরতলী গোবরাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা এখন ৯৬ জন।

১১। মুস্তাফা নামক একজন মুসলমানের বয়স ১০৭ বৎসর। আশ্চর্য্য তাহার দাড়ীর সাদা চুল কাল হইতেছে এবং দন্তহীন মাড়ী হইতে নূতন দন্ত বাহির হইতেছে।

১২। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় মোক্ষমূলারের পুস্তকালয় ক্রয় করিয়াছেন।

১৩। লেডী কুর্জনের বিক্টোরিয়া ছাত্রবৃত্তি ফণ্ডে ৪॥০ লক্ষ টাকা জমিয়াছে।

বামারচনা।

আমি চাহি।

আমি চাহি হেরিতে তোমায়
সুধু এই হৃদয়ের মাঝে,
প্রভাতের অরুণ-প্রভায়,
আর, শান্ত-ছায়াচ্ছন্ন সাঁঝে।
দিবসের উচ্চ কলরবে,
মিশাইয়ে তব কণ্ঠস্বর
সংসারের প্রত্যেক উৎসবে
হাসাইও তাপিত অন্তর।
নিশীথের সুষুপ্তি আঁধারে
আচ্ছন্ন করিলে ধরাতল,
দেখা দিয়ে প্রাণের মাঝারে,
মুছাইয়ে দিও অশ্রুজল।
চরাচর হইবে যখন,
নিদ্রার সমুদ্রে নিমগন,
স্বপনে ও রূপ সুধা পান
করিবে এ তৃষিত নয়ান।
চিরদিন থাকিয়া সহায়,
জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র কাজে,
দেখা দিও জীবন সন্ধ্যায়
তব বিশ্ব-বিমোহন সাজে।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়—পাবনা।

কাল মুখ।

বড় সে ব্যথিত, তারে কর কৃপাদান,
দুঃখ ভরা তার কাল মুখ ;
পরশ্রীকাতর, তার দহিছে পরাণ,
দিবানিশি বিষম সে দুখ !১

জগতের প্রান্তভাগে পড়িয়া সে আছে,
জ্বলিতেছে চিতানল প্রায়,
তোমরা যেও না কভু ওগো তার কাছে,
ঘৃতাহুতি অর্পিও না তায়।২

সুখীর সুরম্য বেশ, প্রফুল্ল আনন,
বড় ব্যথা দেয় তার প্রাণে,
শিরায় শিরায় বিষ করে সঞ্চালন,
যেও নাক তোমরা ওখানে।৩

কি দুঃখব্যঞ্জক তার বিষণ্ণ মূরতি !
নিরখি' বড়ই পাই ক্লেশ !
ঘৃণিও না তারে, সে যে কৃপাপাত্র অতি,
তার দুঃখ যন্ত্রণা অশেষ।৪

করুক সে তব নামে মিথ্যা দোষারোপ,
করুক সে ছিদ্র অন্বেষণ ;
যশস্বীর যশের না হয় কভু লোপ
নীচতায় নীচের কথন।৫

চিত্ত তার অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র অতিশয়,
বড় ভাব ধরিতে না পারে ;
এমন যে দীন আত্মা, হইয়া সদয়
কৃপাদান কর তুমি তারে।৬

ক্রমশঃ উন্নতিশীল জগতের জন,
ইহা তার সহনীয় নয় ;
পরের ভালতে যার মলিন বদন,
তার কি দুঃখের সীমা হয়?৭

তরল হাসিতে তার করাল গরল,
ও হাসিতে ভুল না কখন।
বিজনে আঁধারে ঘোরে থেকে অবিরল
সহক্ সে তুষের দহন !৮

তব পদে জগদীশ, মিনতি আমার,
লিখ না ললাটে হেন দুখ ;
পর-সুখে হয় যেন সুখের সঞ্চার,
দেখিতে পারি না কাল মুখ।

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

জীবন-মরীচিকা।

কুসুম কানন সম, সুন্দর জীবন খানি
জানিতাম আগে মনে মনে।
জানি নাই জানি নাই এত তপ্ত মরুভূমি
সে জীবনে আছে সংগোপনে।

প্রভাত শৈশব কালে, মৃদুল অনিলে দুলে
যে জীবন হাঁসিত সুন্দর,
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়, সে প্রাণে অনল ঢালে
মরুভূমি ধূ ধূ বালুস্তর !

পথিকে সে মরুভূমে, ভুলায়ে কতই ভ্রমে
আশা-মরীচিকা সদা ফিরে,
অগ্নিময় বালু দেশে, দেখায় শীতল জল
ছুটে প্রাণী ব্যাকুল অন্তরে।

কেবলি নিরাশাময়, দুরাশায় দগ্ধ হৃদি
শুধু প্রাণ জ্বলে নিরন্তর,
পিয়াসে নাহিক বারি, রবি-করে নাহি ছায়া,
তবু নহে নিরস্ত অন্তর।

কেন বিভু! এ জীবনে, এত জ্বালা দেহ ঢালি
এত যতনের প্রাণ খানি,
সে প্রাণেতে কেন প্রভো, ভীষণ এ দাবানল
জ্বলিতেছে দিবস রজনী?
বুঝিয়াও বুঝি না যে, নিরন্তর এ সংসারে
জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাক হয়েছে হৃদয়,
তাপিত প্রাণের পরে, সেচহ শান্তির বারি,
তাই ডাকি এস দয়াময়!

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

নীতি-হার।

বিনয়।

নিজে নম্র হয়ে যেই পরে উচ্চ করে,
তাহারেই গুরু ব'লে সকলে আদরে।
তুলাদণ্ডে যত দ্রব্য পরিমাণ হয়,
নীচু যেই দিক্, তারে সবে গুরু কয়।

ক্রোধ।

অপরাধী ব্যক্তি যদি রোষের ভাজন,
রোষ প্রতি রোষ কেন নাহি হয় মন?
রোষ সম শত্রু বল কেবা আছে আর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে করে সংহার।

হিংসা।

আপনার অবস্থায় নাসিকা কুঞ্চন,
পর-শ্রী দেখিলে কেন সকাতর মন?
অনিষ্ট চিন্তায় তব তাহার কি করে?
নপুংসক ছাগ যথা প্লীহা ফাটি মরে।

দয়া।

ধন যারে দাও শুধু তারি ইষ্ট নয়,
যে দেয় তাহারও প্রাণ সুখ-পূর্ণ হয়।
দয়া কি পরম বস্তু দেখ ভাবি মন,
দাতা ও গৃহীতা হয় কল্যাণ-ভাজন।

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা।

আশা-আবাহন।

(হিমাচল শিরে)

অমরাতে পারিজাত ফুটিবে যখন,
আশা দেবি! দীপ হাতে আসিও তখন।
শুভ্র হৃদি শুভ্র হাস, পরা শুভ্র পূতবাস,
ধরণী ফেলিবে দূরে কুহেলী বসন,
তখন গো আশা দেবি! দিও দরশন। ১

আশা দেবি! কভু কি গো দিবে দরশন?
কভু কি জাগিবে পুনঃ এ মৃত জীবন?
মন্দার কুসুম-হার, ছড়াইও চারি ধার,
বিদগ্ধ পরাণ হবে আনন্দে মগন,
যবে তুমি দিবে আসি শুভ দরশন। ২

আশা দেবি! দীপ হাতে হ'ও আগুয়ান,
এ জীবন দীপ যবে হইবে নির্ব্বাণ,
শত অপমান সয়ে, দুর্বিষহ ভার বয়ে
কিবা ফল এ জীবনে বিষাদেতে ম্লান?
কেনই বহি বা বোঝা? আকুল পরাণ। ৩

আশা দেবি! শোন আজি মম নিবেদন,
যদি কভু দয়া করে দাও দরশন,
প্রদোষ না হতে সুখে বাঞ্ছারাশি লয়ে বুকে,
নীরবে নীরবে যবে হব অদর্শন,
নিশ্চয় স্বর্গের দীপ জ্বালিও তখন। ৪

আশা দেবি! শোন শোন এই নিবেদন,
শেষের সে দিনে তুমি দিও দরশন।
যাঁহার কিরণে হাসে এই হিমদেশ,
তাঁহার কৃপাতে হোক্ এই শুভাদেশ,
এ তৃষিত শান্ত হবে, সকল যাতনা যাবে,
পারিজাত ফুল দল হাসিবে তখন,
আশা দেবি! শুনাইও সঙ্গীত মোহন,
নীরবে সুশান্ত ভাবে, হৃদয় ঘুমায়ে রবে,
নির্ম্মল সংসার আর দিবেনা বেদন,
বিদগ্ধ পরাণ পাবে অসীম সান্ত্বন।৫

শ্রী—

বিক্টোরিয়া পারিতোষিক রচনা ফণ্ড।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার স্মরণার্থ গত চৈত্রমাসের বামাবোধিনীতে কয়েকটী রচনা পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ৫টি পারিতোষিকের জন্য (প্রত্যেকটীর ১০্ টাকা করিয়া) ৫০্ টাকার প্রয়োজন। বামাবোধিনীর নিজের অবস্থা পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। সহৃদয় বন্ধুগণের সাহায্যের উপর ইহার অনেক আশা ভরসা। বামাবোধিনীর জুবিলী উপলক্ষে পারিতোষিক রচনা ফণ্ডে অনেক হিতৈষী বন্ধু যেরূপ কিছু কিছু আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ফণ্ডেও সেরূপ করিবেন আশা করিতে পারি। আগামী ভাদ্রে বামাবোধিনী নববর্ষে পড়িলে এই পারিতোষিক বিতরণের ইচ্ছা। ইহার জন্য যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, ইতিমধ্যে পাঠাইলে পরমানুগৃহীত হইব।

রচনার বিষয়।

১। মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবন হইতে কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়।

২। মহারাণী রমণীকুলের আদর্শ ও গৌরব।

৩। আদর্শ রাজ্ঞীদিগের মধ্যে মহারাণীর স্থান কোথায়?

৪। মহারাণীর মর-জীবন ও অমর জীবন।

৫। রমণীর সাম্রাজ্য প্রেমের রাজ্য।

পারিতোষিক রচনা প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত দেড় মাস সময় দেওয়া যাইতেছে। ১৫ই ভাদ্র তারিখ পর্য্যন্ত তাহা গৃহীত হইবে।

৯ নং আণ্টনিবাগান,
কলিকাতা।
১লা শ্রাবণ, ১৩০৮।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
বা, বো, সহঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৯ বর্ষ। ৪৪০ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩০৮; সেপ্টেম্বর, ১৯০১। | ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ঊনচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

এই শুভ ভাদ্রমাসে বামাবোধিনী ৩৯ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাভরে জীবনদাতা বিধাতার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। তিনি সকল সৌভাগ্য ও সম্পদের মূল, তিনিই আবার বিঘ্নহারী বিপদ্‌কাণ্ডারী। বামাবোধিনীর গত জীবনে তাঁহার অপার করুণার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি! তিনি ইহার নববর্ষে ইহাকে নব নব করুণার দান বিধান করুন এবং ইহার পথের বিঘ্ন বিপত্তি সকল অপসারিত করুন। আজি শুভ জন্মোৎসবের দিনে হিতৈষী সকল বন্ধু বামাবোধিনীর প্রীতি-উপহার গ্রহণ করুন এবং সকলেই প্রার্থনা করুন ইহার এবৎসর যেন নিরাপদে কাটিয়া যায়। করুণাময়ের করুণায় এবং বন্ধুগণের প্রার্থনায় বামাবোধিনী আর এক বৎসর নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিলে চত্বারিংশ জন্মোৎসবে বন্ধুগণের সহিত আবার আনন্দ-সম্মিলনে মিলিত হইবে এবং মঙ্গলময় দেবতার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য করিতে পারিবে।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসবে
যে আছ যেথায় এস বোন ভাই!
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি আজি সবে
আনন্দ-সঙ্গীত প্রাণ ভরে গাই।

'পবিত্র উৎসব' বল বন্ধুগণ!
'মঙ্গল উৎসব' এ যে ধরাতলে,
'আনন্দ উৎসব' কে পায় এমন
যুগ যুগান্তের বহু পুণ্যফলে?

বামাদের বোধ হইছে উদয়,
কর্ত্তব্যের পথে তাহাদের গতি,
বামার হৃদয় প্রেমের আলয়,
বামা হবে সর্ব্ব গুণে গুণবতী!

রূপের সহিত গুণের মিলন,
ভক্তি চায় আজি জ্ঞানে বরিবারে।
বিদ্যা শীল ধন—মিল অতুলন—
ভারতী সাবিত্রী লক্ষ্মী একাধারে।

বামাবোধিনীর চির-আকিঞ্চন—
আত্ম-সাধনায় দেবের কৃপায়
লভিয়া রমণী আদর্শ জীবন
নিয়োজিবে তাহা দেশের সেবায়।

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"
গাহিয়াছে কবি—নহে সে কল্পনা,
জাগুক রমণী, তবে যাবে জানা।

মহাশক্তিরূপা রমণী-প্রকৃতি
মহাসুর দল করেছে দলন,
নাশি সমাজের অধর্ম্ম বিকৃতি
পুণ্য রাজ্য পুনঃ করিবে স্থাপন।

বিভু পদে তাই আজি এ প্রার্থনা—
মন্ত্র-পূত করি দি'ন নারী-প্রাণ,
আসুক ভারতে নবীন-চেতনা,
মহিমা তাঁহার হোক্ মহীয়ান্।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-ভ্রমণ—যুবরাজ কর্ণওয়ালের ডিউক সস্ত্রীক মরিসস্ দ্বীপ দর্শন করিয়াছেন।

যুদ্ধ ব্যয়—চীনযুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নগদ ৬॥০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতভিন্ন রণ-পোতাদির ব্যয় আছে।

মৃত্যু—গত (১) ১৯শে জুলাই ঢোলপুরের মহারাজার মৃত্যু হয়। তাহাতে মহারাণী এত শোকাভিভূত হন যে কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। উভয়েরই শবদেহ একত্র ভস্মসাৎ হয়! মহারাণী "সতী" বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। ইঁহাদের ১৮ বর্ষীয় পুত্র ঢোলপুরের রাজা হইয়াছেন। (২) ২ জুলাই এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক টেট দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সেবিকা—আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডফারিণের কন্যা পীড়িতের সেবা করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিক্টোরিয়া বৃত্তিফণ্ড—ইহাতে পঞ্জাবী রমণীগণ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রাজোপাধি—যোধপুরের রাজ-খুল্লতাত মহারাজা সার প্রতাপ সিং চীনযুদ্ধে ইংরাজদিগকে সাহায্য করাতে কে, সি বি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এ উপাধি পূর্ব্বে কখনও কোনও ভারতবাসী পান নাই।

পেনেলের ভাগ্য—নোয়াখালির প্রসিদ্ধ জজ পেনেলকে পদচ্যুত করিবার জন্য বঙ্গীয় ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিয়াছেন। এখন ষ্টেট সেক্রেটারীর হস্তে শেষ বিচার।

পেনেলের দোষের ন্যায় গুণের বিচারও প্রার্থনীয়।

বেথুন স্মৃতি—আগামী ১২ই আগষ্ট মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ৫০ সাংবৎসরিক সমাধি-উৎসব। বঙ্গনারীগণ হৃদয়ের শ্রদ্ধার সহিত এই পুণ্যশ্লোকের গুণ স্মরণ করুন্। ইহাঁর স্মরণার্থ একটী কবিতা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

বন-ভোজনে।

(৪৩৯ সংখ্যা—১১৬ পৃষ্ঠার পর)।

আমি, মনুষ্য কণ্ঠস্বরে যেন কত বল ভরসা পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। আর্ত্তস্বরে কহিলাম "মাগো! ঘোর বিপদাপন্ন জনকে একটু স্থান দেও।" তখন ভিতরে গিয়া দেখি কুটীর খানির মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আছে। আমি নিজের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম ও কিঞ্চিৎ আপনাকে হাত পা সোজা করিয়া নদীর কূলে কূলে ভ্রাতা ভগ্নীর নাম করিয়া অতি চিৎকার স্বরে ডাকিতে লাগিলাম। কুটীরবাসিনী বৃদ্ধার নিকট জানিলাম আমি বেণ্যাঘাটে আসিয়া পড়িয়াছি। পরে গঙ্গাতীরে তীরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি কতকগুলি লোক সন্ধ্যার আঁধার ভেদ করিয়া বড় বড় মশাল লইয়া আমার দিকে আসিতেছে। নিকটস্থ হইয়া দেখি নিদারুণ উদ্বিগ্নমনা পিতা স্বয়ং আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া আর ক্লিষ্ট প্রাণের আবেগ সামলাইতে পরিলাম না, দুই চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলাম "বাবা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সব হারাইয়াছি।" পিতা হৃদয়ের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া বলিলেন "আর এখন বিলম্ব করা উচিত নহে, চল খুঁজি গিয়া।"

মশাল লইয়া ডুবুরীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে গুণা ও ভ্রাতৃজায়াকে পাইল, কিন্তু তাহারা অচেতন। পিতা শেলি নলির জন্য দারুণ ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। আমাকে কহিলেন "ইঁহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ চিকিৎসালয়ে গিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা কর, আমি মেয়ে দুটির অনুসন্ধান করিব।" উহাদিগকে লইয়া চিকিৎসকের নিকট গেলাম। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা উভয়েরই চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমাকে দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, বালিকারা দুটি কোথায় জানিতে চাহিলেন। চিকিৎসকের আজ্ঞামত আমি কহিলাম "তাহারা অন্য ঘরে আছে।" তাহাদিগের জীবনের আশা দেখিয়া নিজে ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে

কিছু ঔষধ লইয়া রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র পিতার কাছে গেলাম। নৈরাশ্যকাতর, পীড়িত ও সমস্ত রাত্রি জাগরণে অপরিসীম শ্রমে শ্রান্ত পিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই সকল লোক জন লইয়া হতাশমনে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। যত খুঁজিতেছেন, তত আরও গঙ্গার গভীরতর তলদেশ হইতে গভীরতম প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে—কিছুতেই নয়ন মনকে বুঝাইতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পরম স্নেহের শেলি আর নাই। তাঁহার এই অপ্রত্যক্ষ দারুণ ক্ষতির জন্য অবিশ্বাসী হৃদয়কে আর গঙ্গাতীর হইতে সরাইতে পারিতেছেন না। মানব-চক্ষু পদে পদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চায়, চক্ষুর অগোচর কার্য্যে বিশ্বাস কোথায়? তাই হাতে হাতে প্রমাণ না পাইলে নয়নের সাধ মিটে না। মনুষ্যের সকল সাধনা চক্ষুর তলে—মুদিয়াই থাকি, মেলিয়াই থাকি। যোগী, ভোগী, সাধু, অসাধু, সৎ, অসৎ সকল ব্যাপার না দেখিলে মনুষ্য জীবন পূর্ণ হয় না। তাই আজ পিতার নৈরাশ্যে আশা-মিশ্রিত সন্দিহান হৃদয় লইয়া পীড়া। আজ যদি শেলির মৃতদেহ খানি তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে এরূপ চিত্তের বৈকল্য থাকিত না—একেবারে শেষ সীমায় গিয়া দাঁড়াইতেন। অনেক অনুসন্ধানে পরাজিত হইলাম। আমি বহু কষ্টে সৃষ্টে একখানি গাড়ি করিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইলাম ও নিজে হাঁসপাতাল হইতে ভ্রাতা ভ্রাতৃজয়াকে লইয়া বাড়ী গেলাম। সকল শোক দুঃখের অপেক্ষা প্রধান আশঙ্কা, ভয় ও ভাবনা—মাতার নিকটে কি বলিয়া মুখ দেখাইব। অকালে তাঁহার লক্ষ্মী সরস্বতী বিসর্জন দিয়া আমার অশক্ত পদদ্বয় তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় না। বাটী পৌছিয়া বহির্ব্বাটীতে থাকিলাম। মাতা কনিষ্ঠ পুত্র ও বধূকে দেখিয়া দারুণ হৃদয়-বিদারক স্বরে তাঁহার প্রাণের শেলির অভাব জানাইলেন। সেই অশ্রুপ্রবাহে কত অশ্রু মিলিত হইয়া শোক-সিন্ধু প্রত্যেক অন্তরকে ভীষণ তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। অশান্তি, অনিদ্রা, অনাহার, অনুতাপ ও অবসন্ন দেহ মন লইয়া আমাদের পরিবারের দুঃসহ দিনগুলা কাটিতে লাগিল। প্রভাত হয়, সন্ধ্যায় ঢাকে। রজনীর গাঢ় তিমির সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে ধুইয়া যায়, কিন্তু মানব প্রাণের ঘোর শোকাচ্ছন্নতা কিছুতেই দূর হয় না। কালের সৈকত রাশি স্তরে স্তরে নদীকে আবৃত ও রুদ্ধ করে, কিন্তু মরমের গূঢ়তম প্রদেশের অন্তঃসলিলা চির-প্রবাহিতা!

* * * * *

ইহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পরিবর্ত্তন-শীল প্রকৃতির কত রূপান্তর! আমাদেরও তাই। আমি মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ হইয়া চাকরী পাইয়াছি। নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে

শাহারণপুরে আসিষ্টাণ্ট সার্জনের পদাভিষিক্ত হইয়াছি। সাংসারিক সুখ দুঃখের বোঝা পৃষ্ঠে বহিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা চিন্তা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কনিষ্ঠা শেলির সেই সরল মুখ খানির প্রতিবিম্ব হৃদয় দর্পণ হইতে সরাইতে পারি না; কিন্তু পিতা মাতার নির্ব্বাপিত আগুন জ্বলিয়া উঠিবার ভয়ে মুখে কিছু প্রকাশ করিবারও যো নাই।

বড়দিনের ছুটিতে দাদা সকল পরিবারকে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেরাদুনে গিয়া কিছু দিন থাকিবেন। কেবল আমার পিতা এলাহাবাদের বাড়ীতেই রহিলেন। তিনি এখনও শেলির বিষয়ে সন্দিহান-চিত্ত। তাঁহার প্রাণের কন্যার মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকাল বিকাল প্রত্যহ সেই গঙ্গাতীরে গিয়া যত দূর দৃষ্টি যায়, চক্ষু প্রসারিত করত খুঁজিয়া লন, ও কল্পনার সাহায্যে এই দেখেন যেন জাহ্নবীর বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া কোমল স্বর্ণবলয়-শোভিত হাত দুখানি বাড়াইয়া কে বলিতেছে "আমায় ধর, আমায় তোল, আমি ভাসিতেছি।" এইরূপে বিষম সন্দেহ দোলায় দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার জীবন কাটিতেছে।

আমি মাতাকে হরিদ্বারে লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। তিন দিনের ছুটি পাইয়া তাঁহাকে লইয়া তথায় গেলাম। হরিদ্বার এখান হইতে নিকট, ৩৪ ঘণ্টার পথ। আমরা ভোরে ৭টায় উঠিয়া, লুকসের ষ্টেশনে একবার গাড়ী বদলাইয়া বেলা ১১টার সময় তীর্থস্থানে পৌছিলাম। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসন জ্বালাপুর হইতে মা গঙ্গার পেয়াদা আমাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। পরে হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র মধুচক্রে মধুমক্ষিকাদল-প্রায় তাহারা চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিল। আমরা যেন ব্যূহের ভিতর পড়িলাম। সকলেই পাণ্ডা হইতে চায়, তাহাদের ঐ এক প্রশ্ন "মশা কোথা বাড়ী? চাটুর্জি, মুখুর্জি কি আছে?" সকলের হাতে এক এক খানি খাতা বহি। এখানকার রীতিই এই, গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপুত্রের খাতায় স্ব স্ব নাম ধাম লেখা। এমন কি পিতা পিতামহ ইত্যাদির নাম গোত্র লেখাইতে হয়, তাহা হইলে উঁহারা যজমান বাঁধিয়া রাখেন। আমি অনেক কষ্টে উহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু একটি লোক নাছাড়বান্দা হইয়া আমাদের সঙ্গ লইল। অবশেষে তাহার খাতায় পিসিমার নাম গোত্র প্রকাশিত হইল, এজন্য তাহার দাবী দাওয়া অধিক। যাহোক আমরা ষ্টেশন হইতে নামিয়া সোজা গঙ্গাতীরে যাইব কিম্বা বাসায় ফিরিব ইহাই বিবেচনা করিতেছি, তখন সেই হরিদ্বার পথপ্রদর্শক পাণ্ডা মহারাজ কহিলেন "এখানে একটি বাঙ্গালী মাইর আশ্রম আছে, সেইখানে সকল বাঙ্গালী বাসা লয়, অতএব আপনারাও গিয়া সেইখানে বাসা লইবেন।" মাতার মনে সেই পরামর্শ ভাল বোধ হইল।

অতএব আমরা দুইখানি একা নামক মর্ত্য-রথ ভাড়া করিলাম। এক খানিতে আমরা মাতা পুত্রে ও অপর খানিতে ভৃত্যরাজ জিনিস পত্র লইয়া উঠিলেন। পাণ্ডাজি পিছু পিছু চলিলেন। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক রকমের লোক কেহ পদব্রজে কেহ রথে চলিলেন। সকলেই তীর্থযাত্রী। একই আশা—একই ভরসা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের একা বেগে যাইতে চেষ্টা করিয়া পারিতেছে না, পথ বড় অসরল—উঁচু নিচু, বাঁকা চোরা। কিন্তু কাহারও সে বিষয় গ্রাহ্য নাই। সকলেই সানন্দে সৌৎসুক্যে প্রকৃতির নবীন দৃশ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে ব্যগ্র। অদূরে শৈবালিক গিরিবর অলস ভাবে ভীমকায় বিস্তার করিয়া শুইয়া আছেন। তদুপরি কত তরু গুল্ম কোমল হরিৎ লতা পাতা ছড়াইয়া সাদরে শৈবালিকের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে, যেন সুকুমার শিশুগুলি মায়ের বক্ষে থাকিয়া গলা জড়াইয়া মধুর চুম্বন দানে ব্যস্ত। সর্ব্ব-প্রাণ-তোষক পবন দুলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই পার্ব্বতীয় শোভাপূর্ণ নির্ম্মল স্বচ্ছ বায়ু-সেবিত প্রকৃতির লীলা-ভূমি হরিদ্বার কিম্বা হরদ্বারকে স্বর্গদ্বার বলিতে কাহার না ইচ্ছা করে? পূত ধারাময়ী জাহ্নবীর জন্মস্থান এখানে। এক কালে সগরবংশীয় ভগীরথ এই স্থান হইতে গঙ্গা-প্রবাহের সৃষ্টি করেন। হিমাদ্রি শিখর ভেদ করিয়া যে স্থান হইতে এই অমৃত ধারা নিঃসারিত হইতেছে, তাহাও ইহার সন্নিকটেই। সেইস্থান গঙ্গোত্রি নামে অভিহিত। যাহোক আমরা বাঙ্গালী মাইর আশ্রমে উপনীত হইলাম। আশ্রম একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী, ভিতরে নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির গৃহ, তৎপার্শ্বে আর একখানি দালান ও উঠান, তার সম্মুখে একখানি রাঁধিবার চালা ও অন্যান্য আবশ্যক স্থান। বাড়িটি ছোট, কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানে পুঁইশাকের একটি মাচা, কয়েকটী কুল গাছও আছে। গৃহস্বামিনী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, কিন্তু সুদীর্ঘ জটাধারিণী, বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ। দেখিতে গৌরবর্ণা। ব্রাহ্মণ-তনয়ার মত আকার প্রকার বটে। অবস্থা সম্পূর্ণ গৃহীর মত হইলেও তিনি নিজ বৈধব্য-দগ্ধ জীবন এই পবিত্র স্থানে এই ভাবে কাটাইতেছেন বলিয়া সাধু ফকির মধ্যে পরিগণিত। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সেই রমণী সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গা স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহ-স্বামিনী কহিলেন "আপনারা কতক্ষণে ফিরিবেন? আমি আপনাদের জন্য পাক করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আজ আমার এক স্থানে যাইবার কথা আছে"—বলিয়াই আবার কহিলেন "আপনারাও কি যাইবেন? গতকল্য এখানে এক জন মহাত্মা আসিয়াছেন, তিনি না কি ত্রিকালজ্ঞ অতি বৃদ্ধ প্রাচীন সন্ন্যাসী, সকলেই তাঁহার

দর্শনে যাইতেছে, আমিও তাঁহাকেই দর্শন করিতে যাইব। তিনি চণ্ডীর পাহাড়ে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন।” এই কথায় আমরাও তাঁহার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা করিলাম ও বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর নহে। অল্পক্ষণ পরে আমরা "হরকি পইড়িতে" পৌছিলাম। হরিদ্বারে এই খানেই সকল যাত্রী স্নান দানাদি করিয়া থাকেন ও অপর পার্শ্বে কুশাবর্ত্তঘাটে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হয়। “হরকি পইড়ির” ঘাটের উপরেই প্রয়োজন উপযোগী দোকান পশার। ইহা ছাড়া ফুলতোলা মালী, দুগ্ধবিক্রেতা, ফলবিক্রেতাও মাঝে মাঝে বসিয়াছে। ঘাটের উপরেও অনেক দেব দেবীর মন্দির। আমরা সম্মুখস্থ সোপানোপরি বস্ত্রাদি রাখিয়া জলে নামিলাম। পাণ্ডাজী সেই খানে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন—“মা সঙ্কল্প কর, হাতে জল লাও, আমি মন্ত্রপাঠ করিতেছি। কিন্তু তুমি বল এইখানে পঞ্চমুদ্রা দিয়া হরির চরণ পুজা করিব।” আমি তাহার এই অযথা আদেশের অপ্রতি-পাল্যতা তাহাকে বুঝাইয়া কহিলাম “তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা অবশ্যই পাইবে।” এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দান অপ্রতিজ্ঞভাবে প্রদত্ত হইল। যথা নিয়মে সেখানকার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী অভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। ঘাটে ও পথে অনেকের মুখেই সেই প্রাচীন সাধুর আগমন বার্ত্তা শুনিলাম ও অনেকেই যাইতেছে দেখা গেল। অতএব আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া সাধু সন্দর্শনে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। বাসায় আসিয়া গৃহ-স্বামিনীর প্রদত্ত ভাত কলাইয়ের ডাল আর পুঁইশাক চড়চড়ি পরমানন্দে আহার করিয়া চণ্ডীর পাহাড়ে চলিলাম। আমার ত কোন কষ্ট হইল না, কিন্তু মা আমার রোগে শোকে কাতর ও ক্লিষ্ট, তিনি যে আরও শ্রান্ত হইবেন ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। অবশেষে নীলধারা অতিক্রম করিয়া আমরা সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিলাম। শত শত যাত্রী অবাধে উঠিতেছে নামিতেছে। আজ অপেক্ষাকৃত লোকের ভিড় বেশী। সকলের মুখে সাধুর মাহাত্ম্য বর্ণিত, আমাদের পৌছিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। মা অতি ধীরে ধীরে হাঁটেন, তাহাতে বেলা অবসানপ্রায়, অপরাহ্ন ৫ টার সময় পর্ব্বতের উপরে গিয়া উপনীত হইলাম। দর্শনার্থিগণ এ সময় আসিতে ভয় পায়, পাছে ফিরিয়া যাইতে অন্ধকার হয়। মন্দিরের পার্শ্বে মহাত্মার আসন শুনিলাম। আমরা মাতা পুত্রে যখন গেলাম, তখন চণ্ডীদেবীর পাণ্ডা ছাড়া আর কেহই তথায় ছিল না। মৃগচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট একটি অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ যোগী। শ্বেত জটা ও শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফে মুখমণ্ডল শোভিত। গৈরিক বসনে দেহ আবৃত। ঋষিবর নয়নমুদ্রিত করিয়া একান্তচিত্তে

ওঁকার ধ্যান করিতেছেন। কেমন পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি, যেন স্বয়ং মহাদেব তপস্যায় রত। আর কি দেখিলাম সে অতি বিচিত্র অভাবনীয় দৃশ্য; উঁহারা কি দেবতা কি মনুষ্য, তাহাও নয়নে মনে ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেল। কি দেখিতেছি সত্য না স্বপ্ন আসিয়া এই ক্লান্ত দেহে কুহকাবৃত করিয়াছে কিছুই ত বোধগম্য হইতেছে না। যেন জয়া বিজয়া দক্ষিণে বামে মহাদেবের দুই পার্শ্বে অবস্থিতা। রমণী দুইটির সন্ন্যাসিনী বেশ। বয়ঃক্রম ২০।২২ বছরের অধিক নয়। এই কোমল প্রাণে কিসের বৈরাগ্য? কেন নবীন বয়সে তাপসী বেশ? এই সুন্দর মুখ-মণ্ডলে কেন প্রীতি প্রফুল্লতার অভাব? পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শ্যামল মেঘে আচ্ছাদিত। আমরা মাতা পুত্রে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া অনিমেষে চাহিয়া আছি, প্রাণের ভিতর ঘোর সন্দেহ-কম্পন হইতে লাগিল। এ যেন শত পরিচিত স্নেহ-সিক্ত মুখ। মায়ের মনে পুরাণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল। অতীতের কাহিনী যেন স্মৃতির ভিতর চমকিয়া উঠিল। তিনি আশার বিদ্যুদালোকে জগতের স্থায়িত্ব দেখিতেছেন, তাঁহার স্নেহের তরু লতা-গুলি বাঁচিয়া আছে, কাননখানি পূর্ণ! কিন্তু সন্দেহের মেঘে ঘোর আচ্ছন্ন, তাই আবার অন্ধ। নয়ন মন সকলি অন্ধ। অবশেষে মা আমার গললগ্নীকৃতবাসে সেই নবীন যোগিনীদ্বয়কেই প্রথম প্রণাম করিতে উদ্যতা হইলেন। তাহারা আপত্তি করিয়া কহিল "ক্ষান্ত হউন, আমাদের গুরুদেবের সমক্ষে আমরা প্রণাম লইতে পারি না।" এই কথা শুনিবামাত্র মাতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সেই রমণীর হাত ধরিয়া নিজের বক্ষের ভিতর টানিয়া কহিলেন "ওগো মা! একবার ত মা বলিয়া ডাক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। এ যে সেই কণ্ঠস্বর যাহা আজ দশ বৎসর শুনি নাই, যে মুখ দেখিবার জন্য নয়ন ব্যাকুল, যে বাক্য শুনিবার জন্য কর্ণ আকুল, একবার ডাক্ মা।" আমার মাতার এই ভাব দেখিয়া নবীন সন্ন্যাসীনির চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সে কহিল "মা কোথায়? আমি কোথায়?" এই বলিতে বলিতে মোহভাবাপন্ন হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয়া রমণী আগন্তুকদ্বয়ের আগমনে এমন ঘটিল কেন ভাবিয়া গুরুদেবের পদবন্দনা করিয়া ধ্যান ভঙ্গ করাইল। তিনি কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ কমণ্ডলুর জল সেচনে প্রথমার চৈতন্য জন্মাইয়া পুনরায় স্বস্থানে বসিলেন। আমি তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলাম "অদ্য সুপ্রভাত, সফল হইলাম চরণ দর্শনে।" সন্ন্যাসী ঈষদ্ হাস্যে চাহিলেন ও কহিলেন "দর্শন পাইলে, এখন প্রস্থান কর, নচেৎ রাত্রিকালে এখান হইতে নামা কষ্টকর হইবে।" মা শুনিবামাত্র কহিলেন "না ঠাকুর, আর যাইব না যে পর্য্যন্ত না

আমার অন্ধ নয়ন খুলিবে। আমি যে সেই সকল দেখিতেছি। সেই মুখ, সেই কথা, সেই স্নেহের টান আমার অন্তরে উথলিয়া যাইতেছে। আমাকে দয়া করিয়া ঐ শিষ্যা দুইটি দান করুন। মানব যখন নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবিতে পারে না, তখনই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। যাহাকে দেখিতে না পাই, তাহারই চিত্র আঁকিয়া চক্ষের সম্মুখে রাখি। স্বরূপের পরিবর্ত্তে প্রতিরূপ কি মনুষ্যের চিত্ত শান্ত করে না?" সন্ন্যাসী কহিলেন "কেন মা ব্যাকুল হইতেছ? ইহাঁরা এখন সংসারের বন্ধন কাটাইয়া পরম সুখের পথ অবলম্বন করিতেছেন। অনেক শিক্ষাতে ইহাদের মনের ময়লা কাটিয়াছে। তুমি কে? ইহারাই বা কে? ইহাদের জন্য এত ব্যাকুল কেন? সংসারের সম্বন্ধ অতি অল্পক্ষণের জন্য। মা গৃহে যাও, ইহারা পরম তাপসী।" তখন আমি করপুটে বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম "আমাদের সন্দেহ অপনোদন যদি দয়া করিয়া করেন, কৃতার্থ হই।" তিনি কহিলেন "বল।" "আপনার আগমন কোথা হইতে?" "কাশীধাম হইতে সম্প্রতি আসিয়াছি, সেইখানে আমার মঠ। উত্তরাখণ্ডে যাইব। আর ত কিছু বলিবার নাই?" আমি কহিলাম "আর একটি কথা জিজ্ঞাসিব ক্ষমা করিবেন, এই সন্ন্যাসিনী দুটির পরিচয়।" সন্ন্যাসী কহিলেন "ইহারা আমার শিষ্যা, এই পরিচয়।" আমার মনে তৃপ্তি হইল না, কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকের বিষয় বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলাম। মা আমার সেই রমণীদ্বয়কে বারম্বার কহিতে লাগিলেন "আহা! কার বাছা, কে এমন সোণার অঙ্গে ছাই মাখাইয়াছে?" প্রথমা রমণী অতি সাবধান দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। সন্ন্যাসী রমণীদ্বয়ের পরিচয় দিতেছেন না, এদিকে সন্ধ্যার মলিন ছায়া আসিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিল। আর বিলম্বে বিপদ সম্ভাবনা জানিয়া মাতাকে কহিলাম। তিনি যাইতে অসম্মতা, অবশেষে সন্ন্যাসীকে কহিলেন "এই রমণীদ্বয়কে যদি দয়া করিয়া একবার আমার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর মন্দিরের মধ্যে যাইতে আজ্ঞা দেন, তবে আমি বিদায় লই।" মায়ের এরূপ কাতর অনুরোধে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। তখন উঁহারা তিনজনে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, আমরা বাহিরে রহিলাম। পরক্ষণেই মাতা আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমণীদ্বয় আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ক্রমে আমার সন্দেহ সরিয়া সত্যে পরিণত হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমা রমণী "দাদা কি এই?" আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম চক্ষের উপর ভ্রূর মধ্য ভাগে সেই কাল তিলটি এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। তখন আর থাকিতে পারিলাম না। কহিলাম "এই কি আমার

শেলি? হা ভগবান্! সত্য প্রকাশকর।” সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদিগকে কহিলেন “শান্ত হও। আমি তোমাদের সন্দেহ ঘুচাইব।” মাতা কহিলেন “এ যে আমার কন্যা ও তাহার সঙ্গিনী, আমি সম্পূর্ণ নিদর্শন পাইয়াছি পরিচয়ে হউক আর নাই হউক। এক্ষণে দয়া করিয়া প্রকাশ করুন কোথায় পাইলেন। আমি জানি আপনি ইহাদের জীবনদাতা; আমি ত জাহ্নবীর কোলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম।” সন্ন্যাসী পূর্ব্ব কথা আরম্ভ করিলেন :—

“তবে শুন। বহুদিন হইল অর্থাৎ প্রায় দশ বৎসর অতীতপ্রায়, আমি একদিন রাত্রে সমাধিস্থ ভাবে কাশীধামের গঙ্গাতীর হইতে স্রোতে বহিয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় এই দুইটি বালিকা উভয়ে উভয়কে ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। আমার গাত্র স্পর্শে আমি দেখিলাম মনুষ্য-দেহ, মৃতকল্প হইলেও জীবিত, সুতরাং আমি উহাদিগকে টানিয়া কূলে তুলিলাম। নিজ মঠে আনিয়া সেবাযত্নে চৈতন্য লাভ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত জ্বর ভোগ করিতে লাগিল। একমাস পরে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হইল, কিন্তু দুইটিরই একটু একটু শরীরের ক্ষতি হইল। আপনি যাহাকে কন্যা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার শ্রবণশক্তি কিছু নষ্ট হইয়াছে ও দ্বিতীয়টির দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। যাহা হউক আমি উহাদের আকার প্রকারে সম্ভ্রান্ত-বংশজা অনুভব করিলাম। প্রায় দুইবৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া দীক্ষিত করিলাম ও রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হইল। পরে ইহাদের বিদ্যা চর্চ্চার সঙ্গে জ্ঞানের তৃষাও বাড়িল। শিষ্যত্ব গ্রহণের উপযুক্তা জ্ঞান করিয়া আমি ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। এই সংক্ষেপে পরিচয়।” মাতা কহিলেন “যথেষ্ট হইয়াছে, আর কি শুনিব! আমার কন্যার বক্ষে যে দুর্গানাম অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নিদর্শন।” এই বলিয়া মাতা শেলির বক্ষস্থিত দুর্গানাম যাহা উল্কি দ্বারা বাল্যকালে আমার ঠাকুরমাতা আদরের উপহার দিয়াছিলেন, খুলিয়া দেখাইলেন। সেই চিহ্নের নীচে আমার দাদার ইচ্ছামত “শ” লেখা হয়।

শ্রীনি—দেবী।

শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত।

[শ্রীম—কথিত]।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁতি ব্রাহ্ম-সমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে]।

আবার ব্রাহ্ম ভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্ম সমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালী পূজার পরদিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজি ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ সাল। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যান বাটিতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে।. শ্রীশ্রীপরমহংস দেব বেলা চারিটা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার গাড়ি আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছিল। তাহারই সম্মুখে দালান, সেই দালানে পরমহংসদেব উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অনেক গুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরয়ালাও (সব জজ) ছিলেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। কোথাও নানা বর্ণের পতাকা, মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যোপরি বা বাতায়ন পথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পল্লবিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লবরাশি। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্বপরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদ-ধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন—যে ধ্বনি আর্য্য-ঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে একবালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার নররূপধারী পরম সন্ন্যাসী, ব্রহ্মগত-প্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার, হরিপ্রেমবিহ্বল ঈশার মুখ হইতে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎস্যজীবিগণ শুনিয়াছিলেন—যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে একবালে বহির্গত হইয়াছিল—যে মেঘগম্ভীর ধ্বনি মধ্যে বিনয় নম্র—ব্যাকুলতাপূর্ণ, 'গুড়াকেশ কৌন্তেয়' শিষ্যের ভাবে সমরক্ষেত্রে মায়াবি-বেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দ গুরু-প্রমুখাৎ এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন :—

"যদক্ষরং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
বিশন্তি যৎ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তেপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।
কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং
অণোরণীয়ান্ সমনুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষং উপৈতি দিব্যম্।”

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দর রচিত বেদীর পানে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপন হইল।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গান গাহিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, “হ্যাঁগা, ঐ গানটী তোমার বেশ, ‘দেমা পাগল করে,’ ঐটী গাও না।” তিনি গাইলেন;—

“আমায় দেমা পাগল ক’রে (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্ত চিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেম-সাগরে।
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে;
ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় মা কবে হব মা ধন্য; ওমা মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে—
তুই প্রেম-উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেম ধনে কর মা ধনী কাঙ্গাল প্রেম দাসেরে॥”

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—“উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব, সর্ব্বাতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।” কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে—দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান্ পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির-প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্য্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যানে নিরত ছিলেন।” তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা দেখিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)।

ভুল।

১

শৈশবেই আমি বাগ্‌দত্তা ছিলাম। আমার ভাবী স্বামী বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। আমি কলিকাতায় পিসিমার বাটীতে থাকিতাম ও লরেটোয় (Loretto Honse) ছিলাম। আমার ভাবী স্বামীর অতিশয় গীত বাদ্যে অনুরাগ থাকায় তাঁহার অনুরোধে গৃহে একজন শিক্ষক আসিয়া সেতার শিখাইতে-ছিল, এবং স্কুলে রীতিমত যত্নের সহিত পিয়ানো শিখান হইত, এবং সকলেই আমার কণ্ঠস্বরের একটু প্রশংসা করিত। আমার ভাবী স্বামী বিলাত যাইবার কিছু দিন পরেই সহসা প্রবাসে আমার পিতার মৃত্যু হইল। সে সময় আমরা কেহই কাছে ছিলাম না। তাঁহার কর্ম্মস্থানে এক-দিন সহসা এপোপ্লেক্সি (সংন্যাস রোগ) হইয়া মারা গেলেন। আমার পিতা একাকীই থাকিতেন, কারণ আমার জন্মের কয়েক দিন পরেই আমার জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। পৃথিবীতে আমার পিসিমা ব্যতীত আর আপনার কেহই রহিল না। তিনি তাঁহার সন্তান-দিগের সহিত আমায় সন্তান নির্ব্বিশেষে পালন করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুতে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া-ছিলাম।

পিতৃশোকের আগুনে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, সকলি মরুময় বোধ হইতেছিল। এই অকূল সংসারে নিতান্ত একাকিনী হইয়াছিলাম, জীবনে কোন সুখ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এমন সময় আমার ভাবী স্বামী বিলাতে পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই সংবাদ আসিল। নিরাশা-ব্যথিত অন্ধকার হৃদয়ে আবার আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। আমার শুষ্ক জীবন যেন আবার বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই প্রকার আশার মোহন আনন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিত। তাহার কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল তিনি শীঘ্র আসিবেন। সুকুমার ও আমি শৈশব হইতে উভয়ে উভয়কে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত? আমিও শৈশব হইতেই তাঁহাকে প্রাণ মন ভরিয়া ভালবাসিতাম। নিতান্ত আমারই জানিয়া আপনা হারাইয়া ভাল-বাসিতাম। তাই কত আশার আগ্রহে তাঁহার আসিবার অপেক্ষায় চাহিয়া রহিলাম।

বৈকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পিসিমা বাটীতে ছিলেন না, ছেলে মেয়েদের লইয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। আমি সারা দিন অসুস্থ থাকায় যাইতে পারি নাই। বৈকালে

বৃষ্টি হওয়ার পর আমার শরীর ও মন একটু প্রফুল্ল বোধ হওয়ায় আমি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। পিসিমার বাটীতে উপর তলায় কেবলমাত্র শয়ন ঘর।

এক কথা বলিয়া রাখি, আমরা কয়েক পুরুষ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এবং আমাদের পরিবারে অন্য দু একজন ও আমার স্বর্গীয় পিতা বিলাত হইতে আসার পর আমাদের চাল চলন সবই সাহেবী ধরণেই চলিয়া আসিতেছে। আমার ত কথাই নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী হইব, রীতিমত সকল শিক্ষাই পাইয়া আসিতেছি। নীচে ড্রইং রুমের সম্মুখেই একটি প্রবেশ করিবার কক্ষ বা হল, হলের পরেই বারান্দা, তাহার পরে গাড়ী বারান্দা। আমি সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গৃহকোণে একাকিনী বসিয়া সেতার বাজাইতে লাগিলাম। তাহার সঙ্গে এই গান গাহিলাম :—

"আকুল পরাণ আপনা হারায়ে,
আজিকে কাহারে চায়,
কার মুখ খানি, কার মধু হাসি
আজি এ পরাণে ভায়।
কাহার আশায়, আছি একাকিনী,
সে আজিকে কোন্ দূরে,
ব্যাকুল বাসনা, আকুল আবেগে
ডাকিছে করুণ সুরে।"

জানি না কতবার এই গীতটি গাহিয়াছিলাম। তন্ময় হইয়া সেই গীত ও বাদ্যে আপনা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সহসা কিসের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম আমার পশ্চাতে একজন যুবা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। আমায় ফিরিতে দেখিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন "আমি বেহারাকে আমার আগমন সংবাদ দিতে মানা করিয়াছিলাম, সে জন্য আমায় ক্ষমা করুন্। আমি আপনার গীত শুনিয়া নিঃশব্দে আসিয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়াছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। তবু সে কণ্ঠস্বর সে আর কাহার, এই কি আমার সুকুমার? আমি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি পুনরায় আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিলেন "কেন, আপনারা কি জানেন না যে, আমি অদ্য এখানে আসিব? দিদির ওখানে ৩টা টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। তিনি কি সংবাদ পাঠান নাই? আমি জাহাজ হইতে নামিয়াই এখানে আসিয়াছি। জিনিস পত্র সব দিদির ওখানে পাঠাইয়া দিয়াছি।"

আমি আনন্দে লজ্জায় অভিভূত হইয়া বলিলাম "বসুন, আমি বেহারাকে আলো দিতে বলি, পিসিমা আজ বেড়াইতে গিয়াছেন।" এই বলিয়া আমি সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। বেহারাকে আলো দিতে বলিলাম। আমার কি ভুল হইতেছিল। পরক্ষণেই সে কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে প্রভাসিত হইল, আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য

উভয়ে উভয়ের করস্পর্শ করিয়া মুগ্ধ-লোচনে আত্মবিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিলাম। সে এখন কবেকার কথা —কিন্তু এখনো জীবন্ত ভাবে মানসপটে জাগিয়া আছে। সে মুহূর্ত্তের সুখ অনন্ত, লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

তিনি অতি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন "এলা! তুমি এত সুন্দরী!"

আমি লজ্জায় হাত ছাড়াইয়া অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিলাম।

যদিও আমার শৈশব হইতেই বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল, কারণ আমার স্বর্গীয় পিতা ও সুকুমারের পিতা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ের একান্ত বাসনা ছিল আমাদের পরস্পরের সহিত বিবাহ দিবেন। সুকুমার শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই ভাই বোনকে তাঁহার পিতা আমার পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তাঁহার দিদির অল্পদিন পরেই মিঃ বসুর সহিত বিবাহ হইয়া যায়। মিঃ বসু কলিকাতায় একজন খ্যাতনামা বারিষ্টার। সুকুমারকে আমার পিতা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। বিলাতে তিনি প্রায় ৬।৭ বৎসর ছিলেন। যদিও মনে মনে জানিতাম যে সুকুমারের সহিত আমার নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে, তথাপি এ পর্য্যন্ত কথনো প্রণয়ের কথা বা পত্র কেহ কাহাকেও লিখি নাই বা বলি নাই। পিতার এ বিষয়ে বিশেষরূপ নিষেধ ছিল, এবং অনুমতি দেন নাই। তিনি বলিতেন "বিলাত পরীক্ষার স্থল, সেথানে গিয়া তাঁহার মতির কতপ্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, বিবাহ স্থির করিয়া রাখা ভাল নহে। আগে বিলাত হইতে আসুক তবে বিবাহের কথা, আর আমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা নাই।" যদিও সুকুমার আমাকে মধ্যে মধ্যে বিলাত হইতে পত্র দিতেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় লিখিতেন। তাই আমরা উভয়ে উভয়কে জানিয়াও উভয়ের নিতান্ত অপরিচিত ছিলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জ্জনে দেখা। এই দৃষ্টিই আমাদের শুভ দৃষ্টি হইল। উভয়ে উভয়ের প্রাণ হাতে করিয়া ধরিয়া ছিলাম, অদ্য প্রণয়-দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া সাদরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলাম।　　　　(ক্রমশঃ)।

গীতাসার ব্যাখ্যা।

৫—৬।

"যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

হে কৌন্তেয়! মোক্ষার্থ যত্নশীল পণ্ডিত ব্যক্তিরও বিষয়াভিমুখী মনকে দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল বিক্ষোভিত করিয়া রাখে। যুক্তযোগী সেই সকল দুরন্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া সমাহিত চিত্তে আমাগত

প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

মনুষ্যের বহিরিন্দ্রিয় দশটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পদ, পায়ু ও উপস্থ। মন একাদশ ইন্দ্রিয়—অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এই মনের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কত বৃত্তি রহিয়াছে, এক অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে শত সহস্র ইন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয় সকলেই আপনার আপনার বিষয় ভোগের জন্য স্বভাবতঃ ব্যগ্র। চক্ষু চায় রূপ, কর্ণ চায় সুস্বর, নাসিকা সুঘ্রাণ, জিহ্বা সুরস এবং ত্বক্ সুখস্পর্শ বস্তু। বাক্য হস্ত পদ প্রভৃতিও অসংযত অবস্থায় যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আর অন্তরের প্রবৃত্তি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি আপনাদিগের চরিতার্থতা অন্বেষণ করে। পশুদিগের মধ্যে কি দেখা যায়? তাহারা ইন্দ্রিয় সকলের উত্তেজনার অধীন হইয়া কার্য্য করে, এই কার্য্য করিতে গিয়া যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়—এমন কি প্রাণ হারায়, তাহাও গ্রাহ্য করে না। পতঙ্গ যে অনলে পুড়িয়া মরে, মৎস্য যে বঁড়িশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়, ইহার কারণ ইন্দ্রিয়াকর্ষণ সামলাইতে পারে না বলিয়া। পশু-প্রকৃতি মানব—যাহারা জ্ঞানহীন ও আপাত সুখভোগের জন্য ব্যগ্র, তাহারা ইতর জন্তুর মত ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া বিনষ্ট হয়। কত সুরাসক্ত, বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের কতই না দুর্গতি দেখা যায়! কিন্তু গীতোপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, মনে করিও না, যে কেবল ইতর ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়। ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃ এমন দুরন্ত যে জ্ঞানী মোক্ষার্থী যে সকল লোক, তাহাদিগের মনকেও চঞ্চল করিয়া আত্মহারা করিয়া দেয় এবং তাহারা ধর্ম্মপথ ও তত্ত্বপথ ছাড়িয়া পুনরায় বিষয়ভোগে রত হয়। কি আশ্চর্য্য, যাহারা ইন্দ্রিয় ভোগ চায়, তাহারাই নয় তাহার স্রোতে ভাসিয়া যাউক; কিন্তু যাহারা তাহা চায় না, প্রত্যুত তাহা ত্যাগ করিয়া মনকে অতীন্দ্রিয় বস্তুতে সমাহিত করিতে চায়, ইন্দ্রিয় ও রিপু সকলের হস্ত হইতে তাহাদিগেরও নিস্তার নাই। সাধক-দিগের জীবনে এই ব্যাপার অতি গুরুতর—অনেক স্থলে সাধারণ লোকের অপেক্ষা তাঁহাদিগের জীবনে পরীক্ষা ও প্রলোভন ভীষণতর আকারে আসিয়া থাকে। কত ঋষি তপস্বী এই জন্য ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া এক মুহূর্ত্তে অধঃপতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয় সকল অতীব বলবান্, তাহারা বিদ্বান্ লোকদিগকেও টানিয়া লইয়া যায়। যোগী যোগভ্রষ্ট, তপস্বী তপশ্চারণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। গীতার অন্য স্থানে আছে "বলবানিন্দ্রিয়-গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি।" গভীর বিদ্যা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান—ইন্দ্রিয় স্রোতে সবই ভাসিয়া যায়। যে যত আপনার শক্তির অহঙ্কারী

হয়, তাহার পতন তত সম্ভব। যাঁহারা একদিকে যেমন পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার অধিকারী, অন্যদিকে তেমনি ধীর, শান্ত ও ধর্ম্মসাধনে সতত যত্নশীল, ইন্দ্রিয় সকল একটু ছিদ্র পাইলে তাহাদিগকেও বিপাকে ফেলিয়া থাকে। সাবধান—অতি সাবধান হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথম আবেগে যদি মনের রাস টানিয়া রাখা না যায়, কার সাধ্য আর সে মনকে স্থির করে? শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্র যেমন শোণিতের আস্বাদান পাইলে ভয়ঙ্কর অদম্য হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয় সকলও ভোগ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে সেইরূপ অদম্য হয়। অবশীভূত দুষ্ট অশ্বকে বশে আনা কত কঠিন, অবশীভূত যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করা তদপেক্ষাও কঠিন। মন একটী খেলনার বস্তুর ন্যায়, বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরের প্রবৃত্তি সকল তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বার মৃত্যুর পথে উন্মুক্ত, মন সেই দ্বার দিয়া সহজে বিনাশ মুখে পতিত হয়।

এই ঘোর বিপ্লবকারী দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করিবার উপায় কি? বাহ্য উপায় আছে—কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও শমদম অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা। যোগিগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া কোন্ সুখাভিলাষ না বিসর্জ্জন করেন এবং কোন্ দুঃখ ক্লেশকে না আলিঙ্গন করিয়া থাকেন! কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগ, লৌহ কণ্টকে শয়ন, পঞ্চতপা হইয়া গ্রীষ্মে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অবস্থান ও শীতে জলে নিমজ্জন প্রভৃতি কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এ সকল উপায়ে কিছু ফল হয় না, তাহা নহে; কিন্তু সে ফল স্থায়ী ও সর্ব্বত্র শুভকর হয় না। গহন বনে লগুড়াঘাতে জন্তু সকলকে বধ করা যেমন দুঃসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল দমন করা তেমনি। কিন্তু বনে দাবাগ্নি জলিলে যেমন জন্তু সকল সহজে পলায়মান ও হত হয়, মনে সেইরূপ প্রকৃত বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হইলে ইন্দ্রিয় সংযম সহজসাধ্য হয়। ঈশ্বরে অনুরাগ হইয়া যাঁহার বিষয়ে বিরাগ হয়, তাঁহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল সহজেই নিস্তেজ হয়—বিষয় বাসনা সকল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" যুক্তযোগী সমাহিত-চিত্ত হইয়া "ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ নাই" এই ধ্রুব বিশ্বাসে তদ্গতপ্রাণ হন। যিনি সচ্চিদানন্দ পূর্ণপবিত্র পরমেশ্বরে নিমগ্নচিত্ত, তাঁহারই ইন্দ্রিয় সকল সংযত এবং তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এইজন্য ইন্দ্রিয়-জয়ী হইবার জন্য কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মের পন্থা অবলম্বন করিলে হইবে না, ভক্তিরসে চিত্তকে আর্দ্র ও সিক্ত করিতে হইবে। আত্মা যে পরিমাণে পরমাত্মাকে "আত্মারাম রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু" জানিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হইবে, সেই পরিমাণে ইন্দ্রিয় সকলের আকর্ষণের অতীত হইবে। আর মন যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের অধীন

হইয়া বিষয়াবর্ত্তে ঘুরিবে, সেই পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়া পরমাত্মা হইতে দূরে গিয়া পড়িবে। এই জন্য সর্ব্ববিধ উপায়ে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত রাখিয়া স্থিতধী মুনি ঈশ্বরে প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয়া মহারাণী ফ্রেডারিক।

ইংলণ্ডের রাজবংশে শোকের পর শোকের স্রোত ক্রমাগত বহিতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর পরলোক গমনের পূর্ব্বে গত বৎসর তাঁহার মধ্যম পুত্র ও দৌহিত্রের মৃত্যু হয়, মহারাণীর বিয়োগ শোক ছয়মাস অতীত হইতে না হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইনি অনেক দিন হইতে পীড়া ভোগ করিতেছিলেন; মাতার মৃত্যুকালেও অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু পরে আরোগ্য লাভ করেন! কিছুদিন হইল উদরের মধ্যে ক্ষত (Cancer) হইয়া গত ৫ই আগষ্ট দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬০ বর্ষের অধিক হইয়াছিল।

মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার সহিত প্রিন্স আলবার্টের শুভপরিণয় ১৮৪০ সালের প্রারম্ভে হয়, তাহার প্রথম ফল এই কন্যা। ইনি ঐ সালের ১৩ই নবেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম রাজকুমারী এডিলেড মেরিয়া লুসা বিক্‌টোরিয়া। ইংলণ্ডের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের উপাধি যেমন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, জ্যেষ্ঠা কন্যার উপাধি সেইরূপ প্রিন্সেস রয়াল। প্রথম রাজসন্তান যেমন পিতা মাতার, সেইরূপ রাজপুরবাসী সকলেরই পরম আদরের বস্তু ছিলেন, বলা বাহুল্য। মাতা ইহাঁকে পুসী ও মিসী বলিয়া ডাকিতেন। ইনি আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রথম ক্রীড়ার সঙ্গিনী ছিলেন। ভাই ভগিনীর মধ্যেও চিরকাল গাঢ় প্রীতি ছিল। রাজকন্যা অনেকটা মাতার প্রকৃতি অধিকার এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস ও স্বাধীন প্রকৃতির কতকগুলি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শৈশবে এক ল্যাম্পে তাঁহার কাপড় ধরিয়া হাত পুড়িয়া যায়, অগ্নি তখনি নির্ব্বাণ করা হইল, কিন্তু রাজকুমারীর কিছুমাত্র অস্থিরতা বা চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই—বলিলেন "মা, হতবুদ্ধি হইও না, বাবাকে ডাকাও।"

১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রুসীয় যুবরাজ ফ্রেডারিকের সহিত ইহাঁর শুভ পরিণয় হয়। সে সময় ক্রিমীয় যুদ্ধ লইয়া ইউরোপ ব্যতিব্যস্ত, তথাপি মহা মহারোহে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রুসিয়া তখন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল এবং প্রুসীয়-রাজ প্রথম উইলিয়মের তত ক্ষমতা ও গৌরব ছিল না। কিন্তু এই রাজবধূ রাজলক্ষ্মীরূপে

শ্বশুরের গৃহে আগমন করিলেন এবং তদবধি তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে জর্ম্মণির ক্ষুদ্ররাজ্য সকল প্রুসিয়ার সহিত সংমিলিত হইয়া এক মহা সাম্রাজ্য সংগঠন করিল এবং ১ম উইলিয়ম বর্ত্তমান জর্ম্মণির প্রথম সম্রাট্ বলিয়া আখ্যাত হইলেন। ফ্রান্সকে মহাযুদ্ধে পরাজয় করিয়া জর্ম্মণি অসীম গৌরব লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের প্রভাব ও মহিমা বর্দ্ধিত হয়। আমাদের রাজকুমারী এই গৌরবান্বিত পরিবারের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াও চিরদিন স্থির ধীর ও নম্র প্রকৃতি ছিলেন। তিনি স্বহস্তে বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিতেন এবং অবসরমতে কোন কোন গৃহকার্য্যও করিতেন। সম্রাট্ পরিবারের কোনও মহিলা "ভৃত্যোচিত কার্য্য" করেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করেন। ইহাতে তিনি তেজের সহিত নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "ব্রিটিষ সাম্রাজ্যেশ্বরী আমার জননী যে কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাহাতে তাঁহার কন্যার অগৌরব কি?" সুমাতার উপযুক্ত সুকন্যার কথাই এই। ইহাঁর ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা সন্তান হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জর্ম্মণির বর্ত্তমান মহামহিমান্বিত সম্রাট্ ২য় উইলিয়ম। দুইটী সন্তান ইতিপূর্ব্বেই গত হয়। স্বামিসেবা ও সন্তান পালনে রাজবধূ আদর্শ ছিলেন। ইংলণ্ডের জাতিমধ্য-প্রদর্শনীতে মহারাণী বিক্টোরিয়ার কন্যা জামাতা উপস্থিত হন; তাহাতে যুবরাজ ফ্রেডারিক তাঁহার পত্নীকে "জর্ম্মণির প্রতিনিধি" বলিয়া পরিচয় দেন।

মেরিয়া লুসা জর্ম্মণির সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব ও সম্মিলন রক্ষার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম উইলিয়ম ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেও ইংরাজ জাতির প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন এবং ইংরাজদিগকে অপদস্থ করিবার অনেক সুযোগ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজমন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিসমার্ক ইংরাজজাতির নিন্দাবাদ করিলে রাজকুমারী বলিতেন "আমি ইংরাজ কন্যা, আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিবেন না।" মাতার ন্যায় তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মণির বিরোধের কারণ ঘটিলে প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার অপনয়ন করিতেন।

প্রথম উইলিয়মের মৃত্যু হইলে ফ্রেডারিক জর্ম্মণির সম্রাট্ পদে বৃত হন। কিন্তু অসুস্থ দেহে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ৩ মাসের অধিক রাজত্ব করিতে পারেন নাই। আমাদের রাজকুমারী "এম্প্রেস্ ফ্রেডারিক" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে কেবল পীড়িত স্বামীর সেবা করিয়া বৈধব্যব্রত গ্রহণের জন্য। স্বামিবিয়োগ শোক তাঁহার হৃদয়কে এরূপ অধিকার করে যে, তদবধি তিনি বাটীর বাহির হইতেন না এবং কোনও উৎসবাদিতে যোগ দিতেন না। মাতার

ন্যায় আজীবন স্বীয় পতির স্মৃতি হৃদয়ে রক্ষা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রাজকুমারীর মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সকল আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহার নিকটস্থ ছিলেন, কেবল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স হেনরী কার্য্যোপলক্ষে স্পেনে যান। ভারত সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড সস্ত্রীক সহোদরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। ইঁহার বিয়োগশোক সমগ্র সভ্যজগৎকে—বিশেষতঃ জর্ম্মণি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। শান্তি-দাতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তিনি তাঁহার শান্তির রাজ্যে মাতৃ-দেবীর সহিত কন্যাকে সম্মিলিত করিয়া চিরশান্তি বিধান করুন্ এবং ইংলণ্ড ও জর্ম্মণির মিলনসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখুন।

বেথুন পঞ্চাশৎ বার্ষিক সমাধি-উৎসব।

(১৯০১।১২ই আগষ্ট—সোমবার)।

স্বর্গীয় মহাত্মা বেথুন সাহেবের মৃত্যুদিন স্মরণে লিখিত।

(১)

আজি প্রকৃতির নীরবতা মাঝে
কল্পনা ভেদিয়া, দূরে ছুটে যায় প্রাণ,
তোমারি অমিয় মুর্ত্তি হৃদয়েতে রাজে,
চারিদিকে শুনি যেন ত্রিদিবের গান।

(২)

কত মাস—কত বর্ষ—সুদূরে বিলীন,
তবু গায় ধরা তব পবিত্র বারতা ;
ভক্তিভরে ও চরণে নমি প্রতিদিন
জানাইছে হৃদয়ের শত কৃতজ্ঞতা।

(৩)

মহান্ প্রশান্ত তব উদার হৃদয়
সাধিয়াছে ভারতের যতেক কল্যাণ,
সে কথা স্মরিয়া প্রাণ পুলকিত হয়,
সমগ্র ভারতে শুনি তব যশোগান।

(৪)

অধম, পতিত দেশে রমণীর তরে
ছিল না শিক্ষার রীতি, বিন্দু স্বাধীনতা,
তোমারি যতনে আজি প্রতি ঘরে ঘরে
রমণী শিখিছে কত অভিনব কথা।

(৫)

বেথুন ইস্কুল তব যতনের ফল,
স্বর্ণাক্ষরে তব কীর্ত্তি ঘোষিবে সতত,
বিদ্যা জ্যোতি প্রাণে যত হইবে উজ্জ্বল,
তোমারে পূজিবে নারী করি শির নত।

(৬)

বিদেশের তরে কেবা খাটে এত ক'রে ?
কে করে কঠিন শ্রম স্বার্থ সুখ নাশি।
কে ভাবে রজনী দিবা বঙ্গবালা তরে,
সুদূর ইংলণ্ড হ'তে এত দূরে আসি ?

(৭)
স্বরগ হইতে এসে বিধির আদেশে
করেছ রমণী তরে যে মহৎ কাজ,
সে কথা স্মরিবে সবে স্বদেশে বিদেশে,
ভারত-নারীর শিক্ষা ধন্য হোক্ আজ।

(৮)
আর যত কাজ তুমি করেছ এদেশে,
সকল পড়িছে মনে আজি এই খানে,
তোমার অমর আত্মা দেবের আশীষে
লভুক অতুল সুখ শান্তি-সুধাপানে।

(৯)
তোমার দয়ার কথা জাগিছে পরাণে,
অধমা রমণী মোরা! বর্ণিতে কি জানি?
হৃদয়-আসনে তোমা বসায়ে যতনে,
পুজিব সাদরে দেব! পুষ্প অর্ঘ্য আনি।

(১০)
পরমেশ-পদে মোরা এই ভিক্ষা চাই,
তোমার মহত্ব যেন না ভুলি কখন,
যখন যে ভাবে থাকি, যেখানেতে যাই,
(যেন) এই দিনে ভক্তি ভরে নমি ও চরণ।

শ্রীসুকুমারী দাস।

কামিনীর কেশ।

প্রাজ্ঞ পুরুষের কথা যেমন অপণ্ডিতের মুখে বা লেখনীতে ব্যাখ্যাত বা অভিব্যক্ত না হইয়া যোগ্য পুরুষের দ্বারা বিবৃত হইলে অধিকতর শোভা পায়, সেইরূপ স্বাভাবিকী লজ্জাশীলা কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোকদিগের কোনও কথা, পুরুষের মুখে বা লেখনীতে অভিব্যক্ত না হইয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা বর্ণিত হইলেই অধিকতর শোভা পাইতে পারে। কোমলহৃদয়া, সহজে কাতরা এবং সহজে লজ্জাবতী স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, অথবা দেহের কোনও অংশের বিবরণ করিতে হইলে পুরুষকে নানাকারণে বহুল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক লেখিকার পক্ষে সে অসুবিধা না থাকাই সম্ভব। দুর্ভাগ্য ক্রমে, এদেশে শিক্ষার দোষেই হউক অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, পুরুষ জাতির মধ্যে যে পরিমাণে সুশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে পরিমাণে স্ত্রী জাতির মধ্যে শিক্ষিতার সংখ্যা নাই, সুতরাং অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোকের কথা পুরুষকে লিখিতে হয়। ইহাতে অনেক স্ত্রীলোকের হয়ত আপত্তি থাকিতে পারে, হয়ত অনেক পুরুষের হৃদয়ে লজ্জার সমাবেশ হইতে পারে, কিন্তু এই প্রবন্ধের লেখক শৈশব, বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, সুতরাং যুবতী কামিনীর কেশ বর্ণনায় তাঁহার মনে দ্বিধা উপস্থিত না হইবারই সম্ভাবনা।

স্ত্রীলোকের কেবল কেশের বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; যুবতীর কেশের কৃষ্ণত্ব বা দীর্ঘত্ব লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নাই, অথবা কবি বা চিত্রকরগণ সুকেশিনী কামিনীর কেশগুচ্ছের যেরূপ বর্ণনা করেন, আমরা স্ত্রীলোকের কেশের সেরূপ বর্ণনা করিব না। কামিনীর কুন্তলরাশি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। স্ত্রীলোকের কেশে যে অপূর্ব্ব ভেষজ-শক্তি এবং অপূর্ব্ব ভেষজ-গুণ আছে বোধ হয় অনেক স্ত্রী-লোক কেন, অনেক পুরুষ চিকিৎসকও তাহা অবগত নহেন। তদ্ভিন্ন, কামিনীর কেশের অসাধারণ পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রাচীন লোকদিগের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারও আভাস পাওয়া যাইবে। স্ত্রীলোকের কেশের শক্তি এবং গুণ না থাকিলে, প্রাচীন কালের প্রাজ্ঞেরা কামিনীর কেশকে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ যে কোনও জীব এবং যে কোনও পদার্থকে অসাধারণ গুণশালী দেখিয়াছেন, পরিণামে সেই জীব এবং সেই পদার্থের পূজা করিতে পৃষ্ঠপদ হয়েন নাই, এই জন্যই ভারতে গাভী, অশ্বত্থবৃক্ষ, ব্রাহ্মণ, বিহঙ্গপক্ষি প্রভৃতির পূজার সৃষ্টি হয়; এই জন্যই প্রাচীন ড্রুইডেরা (Druids) তরুজাত লতার (Misletoes) আরাধনা করিতেন এবং এই জন্যই মিশরে এবং পারস্থে "পোলাই" প্রস্তরের এবং অগ্নির উপাসনার সৃষ্টি হয়। স্ত্রীলোকের কেশ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের লোকদিগের মনে কিরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল, প্রথমে আমরা তাহাই দেখাইতে ইচ্ছা করি।

পুরাকালের য়িহুদী জাতি, স্ত্রীলোকের কেশে 'ঈশ্বরের প্রিয় দূতদিগের আবাস আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই তাঁহাদের (Old Testament) নামক ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তর্গত বহুল পুস্তকে 'স্ত্রীলোকের কেশের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি', এই প্রকারের বহুবিধ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ওল্‌ড্‌ টেষ্টামেণ্টের "জেনেশীশ্‌" নামক পুস্তক হইতে "মালাকাই" নামক শেষ পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ করিলে প্রায় পঞ্চ-বিংশতি স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইসায়া (Isiah) নামক মহা-প্রসিদ্ধ য়িহুদী শাস্ত্রকার, ওল্‌ড টেষ্টা-মেণ্টান্তর্গত তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন "স্ত্রীলোকের কেশের মত ইহা পবিত্র" ইত্যাদি। য়িহুদী বংশাবতংস মহা-মতি য়িশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া-ছিলেন "একটি শুক্লবর্ণ কেশকে কৃষ্ণবর্ণ অথবা একটি কৃষ্ণবর্ণ কেশকে শুক্লবর্ণ করি-বার অধিকার কাহারও নাই।" নিউটেষ্টা-মেণ্ট্‌ নামক নূতন বাইবেলের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বিশপ নক্‌শ্‌ (Knox) লিখিয়াছেন "য়িশু যে সময়ে এই কথা ব্যক্ত করেন, সেই সময়ে তথায় এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান ছিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকের কেশের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া খৃষ্ট এই কথা বলিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের কেশের শক্তি সম্বন্ধে লোকের মনে এরূপ দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তাহারা বিশ্বাস করিত যে কামিনীর কেশে মনুষ্যের কোনও অধিকার নাই, ইহার পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরের দূতগণ কামিনীর কেশের বর্ণ পরিবর্তন করিতে দেন না” ইত্যাদি। নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের আর এক স্থলে যিশু বলিয়াছেন “The Hairs of the head are numbered” অর্থাৎ (ঈশ্বর কর্তৃক) “মাথার চুলগুলিরও সংখ্যা করা হইয়াছে।” প্রোক্ত প্রাজ্ঞ বিশপ্ নক্স অনুমান করেন, যিশুর এই প্রসিদ্ধ উক্তি জনৈক স্ত্রীলোকের কেশ সম্বন্ধে অবতারিত হইয়াছিল। অর্থাৎ “তৎকালীন য়িহুদী জাতি স্ত্রীলোকের কেশ গুচ্ছকে এতই পবিত্র বিবেচনা করিত যে, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল—স্ত্রীলোকের এক একটি কেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের খাতায় লেখা আছে এবং তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সংখ্যা করা হইয়াছে।” আসিরিয়া দেশের রাজা নেবুকাড্‌নেজরের শাসনকালে, স্ত্রীলোকের কেশ কাটিয়া দেওয়ার জন্য একজন ধনবান্ ভূম্যধিকারীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে লেখা আছে। বাবিলন দেশে একদা কুমারী স্ত্রীলোকর কেশের সুবর্ণের ন্যায় মূল্য ছিল, তাহাও আমরা পড়িয়াছি। মিশরের লোকেরা আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সময়ে “আমার মাতার মাথার কেশের নামে শপথ করিতেছি” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ধলভূমের খেড়া নামক আদিম অসভ্য জাতির মুখে এখনও “চুলের শপথ করিয়া বলিতেছি” ইত্যাদি প্রকারের প্রতিজ্ঞা কথায় কথায় শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের কোরাণের ন্যায় সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ বিশেষে (তাহার নাম হদিশ্ শরিফ্) স্পষ্টতঃ লেখা আছে “মহম্মদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তাঁহার পত্নী আয়েশা বিবি মনে মনে অসন্তুষ্টা হইলেন এবং মহম্মদকে প্রশান্ত করিবার জন্য বলিলেন, আমি তোমার বিরক্তি উৎপাদনের মৌলিক কারণ নহি; এ কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে দেখ, আমি আমার মাথার চুলে শপথ করিতে স্বীকৃত আছি।” ইত্যাদি। হিন্দু জাতির কাব্যাদিতে, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে—বিশেষতঃ পুরাণে স্ত্রীলোকের কেশ সম্বন্ধে নানা কথা আছে। চুলের বর্ণনা না হইলে কামিনীর কমনীয়তার বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকে, ইহাই প্রাচীন হিন্দু কবির ধারণা ছিল। বুদ্ধদেবের আনন্দগিরি নামক প্রিয়তম শিষ্য সিংহলের অন্তর্গত অনন্তপুর নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন “স্ত্রীলোকের কেশ যেমন পবিত্র বলিয়া পরিগণিত, এই বাক্যও সেইরূপ পবিত্র” ইত্যাদি। তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকের কেশকে পবিত্র বলিয়া প্রাচীন জাতিদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কামিনীর কেশ পবিত্র হউক আর না

হউক তদ্বিষয়ে আমরা কোনও তর্ক করিতে চাহি না, কিন্তু ইহা যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই কেশ না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা নিতান্তই দুঃখিতা হইয়া থাকেন এবং এই জন্যই টাক ইত্যাদি পীড়া স্ত্রীলোকের চক্ষুশূল। অনেকে যশস্বিনী হইবার জন্য অভিলাষিণী হইতে না পারেন, কিন্তু সুকেশিনী হইবার ইচ্ছা কোন্ স্ত্রীলোকের মনোমধ্যে বলবতী নহে? স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কার না মিলিলেও অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্তুষ্টা থাকা সম্ভব, কিন্তু কামিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক ভূষণ কেশ না থাকিলে বোধ হয় কোনও স্ত্রীলোকেই মনে মনে প্রফুল্লিতা থাকিতে পারেন না। এই জন্য ভারতবর্ষের কারাগার সমূহে দুষ্টা স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিয়া দেওয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দণ্ড বলিয়া গণ্য হয়।

কেশের পবিত্রতা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এক্ষণে ইহার অপূর্ব্ব শক্তি ও অপূর্ব্ব গুণের কথা বলিতেছি। স্ত্রীলোকের কুন্তলে মোহিনী শক্তি আছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি। প্রবাদ আছে, কৈলাসের অপ্সরাদিগের মাথার কেশ না পাইলে মদনের ফুলধনু বাঁধা হইত না। পুরাতন ইংরাজী ভাষার বিখ্যাত কবি স্পেন্সার (Spencer) তাঁহার "ফেয়ারি কুইন" নামক সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কাব্যের স্থল বিশেষে লিখিয়াছেন "সাবধান! ঐ স্থানে অতি সাবধানতার সহিত যাওয়া উচিত, কারণ ঐ স্থানে সুকেশিনী কামিনী দণ্ডায়মান আছে। উহাদের ঐ কেশের গুণে তুমি মন্ত্রমুগ্ধ হইতে পার।" কবিবর চশার (Chaucer) তাঁহার কান্টার্‌বরী গল্প (Canterbury Tales) মধ্যে লিখিয়াছেন "স্ত্রীলোকের কেশের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলবান্ নেপিদো অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।" স্ত্রীলোকের কেশে বাস্তবিক কোনও মোহিনী শক্তি—বৈদ্যুতিক শক্তি আছে কি না এই প্রবন্ধের প্রবীণ লেখকের তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু এখন দেখা উচিত, কামিনীর কেশে এমন কোনও শক্তি বা গুণ আছে কি না যদ্দ্বারা জগতের কোনও উপকার বা অপকার হইবার সম্ভাবনা।

এ কথা বোধ হয় অনেকের জানা নাই যে, স্ত্রীলোকের কেশ ভয়ানক বিষাক্ত। কেবল 'বিষাক্ত' বলিলেই ইহার যথেষ্ট বর্ণনা করা হয় না, এই কেশের যথেষ্ট উপকারিতা গুণ এবং যথেষ্ট অপকারিতা দোষ দেখা যায়। আমি আমার জীবনের বহু বর্ষকাল নানা দেশ ভ্রমণে এবং নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, শিক্ষা ও পরীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছি। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় অর্দ্ধশত ভিন্ন ভিন্ন জাতির নানাবয়স্কা স্ত্রীলোকের কেশ লইয়া আমি নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছি, তদ্ব্যতীত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ প্রভৃতি

বহুতর দেশে পরিব্রজন করিয়া কামিনীর কেশ সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সমুদায়ের বিস্তৃত বিবরণের আশা করা বৃথা। সংক্ষেপে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বোধ হয় ইহা অনেকের জানা নাই যে, কুমারী অথবা সম্পূর্ণরূপে পতিস্পর্শরহিতা স্ত্রী-লোকের মাথার সামান্য পরিমাণে কেশ লইয়া যদি কাঁচি দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রূপে কর্ত্তন করতঃ কাঁচা আনারসের সহিত মিলাইয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা পাকস্থলীতে স্পর্শ করিবার অনধিক তিন ঘণ্টা কাল মধ্যে নিশ্চয় গর্ভস্রাব হইয়া যাইবে; পরীক্ষিত সত্য। বহুদিনের পুরাতন ক্ষতে বা ঘায়ে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পক্ক কেশ ঐরূপে সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিয়া কেবলমাত্র শুষ্ক নিম্ববল্কল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে আশু তাহার প্রতীকার হইবে, ইহাও আমার নিজের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। সর্পাঘাতের সংবাদ পাইবা মাত্র, কুমারী স্ত্রীলোকের মাথার চুলকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া যদি হাতিশুঁড়ো নামক ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষের মূলের সহিত মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগী মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু রোগী নির্ব্বাক্ বা সম্পূর্ণ স্পন্দহীন হইয়া গেলে ঔষধ প্রয়োগের বড় সুবিধা থাকে না। গরুর বসন্ত হইলে, যুবতী স্ত্রীলোকের চুল কাঁজির সহিত মিশাইয়া গরুকে খাইতে দিয়াছিলাম, ইহাতে তাহাদের বসন্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজি ১৮৮৮ অব্দে এক খানি গ্রীক ভাষার গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, লেখা আছে "যে যে স্ত্রীলোকের মাথায় বড় বড় টাক আছে অথবা যাহাদের মাথায় চুল নাই, তাহাদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নামক রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা" ইত্যাদি। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; মাথার চুলে স্নায়ুর বিশেষ উপকার করে এবং স্মৃতিশক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। "স্নায়বিক দুর্ব্বলতা" রোগে আমরা দুর্ব্বা রসের সহিত স্ত্রীলোকের কালো কেশ বাটিয়া গোপনে গোপনে অনেককে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম; বলা বাহুল্য শতকরা ৮৬ জন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধ লেখকের মাথার চুল এক সময়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ ছিল; পথ দিয়া চলিয়া গেলে মাথার চুল ভূমিতে লুটাইয়া পড়িত; সময়ে সময়ে ঐ চুলের সাহায্যে প্রবন্ধ-লেখক অনেক শিশুর তড়্কা রোগের উপশম করিয়াছে। শিশু বা বালক মূর্চ্ছা-গ্রস্ত হইলে, তাহাদের দেহে লেখক তাহার চুল পুনপুনঃ বুলাইয়া দিতেন এবং তদ্দ্বারা উহাদের চৈতন্য সম্পাদন হইত। স্ত্রীলোকের চুলে এই শক্তি আছে কি না, পরীক্ষা করায় জানা গেল, সে শক্তি কামিনীর কেশে নাই। পুরুষের

কেশ এবং স্ত্রীলোকের কেশ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট। কি বিপরীত সম্বন্ধ! কি আশ্চর্য্য বৈপরীত্য! বলবতী স্ত্রীলোকের কেশ যদি কোনও দুর্ব্বল বালিকার গাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া যাইবে, ইহাও পরীক্ষিত সত্য। বলবতী স্ত্রী-লোকের কেশ এবং বড় বড় হরীতকী বাটিয়া সর্ষপ তৈল সহ মিশ্রিত করতঃ দুই দিন গায়ে মাখিয়া দেখিলে ভাল হয় না? তাহা হইলে এই প্রবন্ধ-লেখককে না জানি কত অশ্রাব্য কথাই শুনিতে হইবে! ঐরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিলে মনে গ্লানি, চঞ্চলতা, মস্তিষ্কে বেদনা এবং শরীরে অসুস্থতার উৎপত্তি হইবে। স্ত্রীলোক বা পুরুষ যদি কেহ ভ্রমক্রমে বা সজ্ঞানে বিষপান করিয়াছে জানিতে পার, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে অথবা চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্ববর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত যুবতী স্ত্রীলোকের কেশ তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিতে দিবে, তাহা হইলে বিষের বিস্তৃতি নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া থাকিবে। এইরূপে কামিনীর কেশের অনেক গুণ এবং অনেক দোষ দেখান যাইতে পারে।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মহদ্বাক্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

১২। যখন ভাল ও মহৎ কাজ করি, তখন আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব আমা-দিগের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে।

১৩। যদি কাহাকেও কোন অনুগ্রহ করিয়া থাক, তাহা তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হও, আর যদি কেহ তোমাকে কোন অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহার স্মৃতি অনন্তকাল হৃদয়ে জাগরিত রাখিও।

১৪। সহিষ্ণুতা সকল দুঃখেরই মহৌষধ।

১৫। যে মৃত্যু কামনা করে, সে ইহাই প্রকাশ করে যে, তাহার পক্ষে জীবন ভারবহ এবং সে জীবনের প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারে নাই।

১৬। সে মিষ্টতার প্রয়াসী হইও না, যাহার পরিণাম তিক্ততা।

১৭। যাহা হারাইয়া যায়, তাহাকে কখন ধন বলিয়া জ্ঞান করিও না।

১৮। রিপুদলকে জয় করিয়াছ? তাহা হইলে তুমি ত সম্রাটের সম্রাট্।

১৯। যে পরিশ্রম করিতে সমুৎসুক, সে কখনও কর্ম্মের অভাব বোধ করে না।

২০। অন্যের দোষ মার্জ্জনা কর, কিন্তু নিজের দোষ মার্জ্জনা করিও না।

80

২১। লোকে কি বলিবে, ইহা ভাবিয়াই সাধারণ লোকে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, কিন্তু বিবেক কি বলে, তাহা বুঝিয়াই তুমি সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও।

২২। যে মুহূর্ত্তে তুমি পাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার পাপের শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলেই এই কথার সত্যতা প্রতীতি করিতে পারিবে।

২৩। এমন কোন অমঙ্গল হইতে পারে না, যাহার পশ্চাতে কিছু না কিছু মঙ্গল নাই।

২৪। দোষ স্বীকার করা নির্দ্দোষিতার প্রায় সমতুল্য।

২৫। চেষ্টা দ্বারা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার যে সুখ, তাহা অতি মধুর।

২৬। সহিষ্ণুতা থাকিলে আত্মার লুক্কায়িত সম্পদ আমাদিগের নয়নগোচর হয়।

২৭। যিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি সমস্ত মানব জাতিকে আত্মবৎ ভাবেন।

২৮। যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, ভাবিও যেন দশটী চক্ষু তোমার উপর সর্ব্বদা নিপতিত রহিয়াছে এবং দশটী হস্ত তোমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া তোমার কার্য্যের প্রতি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

কুসুম সরোবরের অনতিদূরে নারদকুণ্ড নামক একটি কুণ্ড এবং তৎসন্নিহিত রমণীয় কানন প্রদেশ এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হোলীখেলার স্থান বিশেষ দর্শনীয়। এই স্থান হইতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যাত্রা। গিরি গোবর্দ্ধনের মহিমা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কি রূপে বর্ণিতে পারি! ভগবদ্ভক্তগণই ইহার মর্ম্ম বুঝেন। জানিনা ভক্তগণ গিরি গোবর্দ্ধন পরিক্রমণ করিতে করিতে কি ভাবে বিভোর হইয়া হাসে, কাঁদে নাচে, গায়। আমরা পাষণ্ডী, আমরা অপরাধী, তাই সেই অমূল্য রত্ন প্রেমধনের এক কণামাত্রও লাভ করিতে সমর্থ হই না। প্রেমভক্ত্যবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একদিন শ্রীক্ষেত্রের চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন ভ্রমে প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেন যে তিনি গোবর্দ্ধনকে এত ভাল বাসিতেন, তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ভক্তগণই জানেন। সে সমস্ত গূঢ় সাধনরহস্য আমাদের মত নরকীটের বোধগম্য হইবার সাধ্য কোথায়?

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত সমুদয় স্থান পরম নির্জ্জন শান্তিময় প্রদেশ। এই গিরিরাজকে পরিক্রমণ করিতে হয়।

হইলে অপরটাতে সাত ক্রোশ হয়। গোঁসাই যাত্রীদল সোজা পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। প্রদক্ষিণ করাকে এদেশে পরিক্রমা বলে। পরিক্রমার মধ্যে স্থানে স্থানে তাঁহারা ২।৪ দিন কোন কোন স্থানে ৫।৭ দিন বাস করিয়া রাসাদি লীলা এবং বিবিধ আনন্দ করিয়া থাকেন। গোবর্দ্ধনের যে স্থানে মানসীগঙ্গা, চক্রেশ্বর নামক বিখ্যাত শিবলিঙ্গ, এবং পুরাণ প্রসিদ্ধ হরিদেবজী আছেন, সেই সহরময় স্থানটী গোবর্দ্ধন নামে বিখ্যাত। রাধাকুণ্ড অথবা কুসুম সরোবর হইতে পরিক্রমণ আরম্ভ করিয়া এই স্থানে পরিক্রমণ শেষ হয়। গোঁসাই যাত্রীদল কুসুম সরোবর হইতে যাত্রা করিয়া তথা হইতে এক মাইল দূরে মানসী গঙ্গার যে স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাখণ্ড দানলীলা করিয়াছিলেন, সেই দানঘাটীতে আসিয়া রাসলীলা * করিয়া এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূর চন্দ্র সরোবর নামক স্থানে যাইয়া একদিন বাস করেন। এই সরোবরটী কুসুম সরোবরের মত সুদৃশ্য এবং এই স্থানটী ততদূর কাননপূর্ণ শান্তিময় প্রদেশ না হইলেও একেবারে জনকোলাহল পূর্ণ নহে। এখানে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ নামক কুঞ্জ বাটিকাটী পরম সুন্দর। বৃন্দাবনের নিধুবন বা নিকুঞ্জবনের নিভৃত কুঞ্জের ন্যায় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ কেবল তরু লতা মণ্ডিত নির্জ্জন নহে। এখানে মহাপ্রভুর বৈঠক এবং কয়েকটী সাধু মহাত্মার সমাধি মন্দির ভিন্ন মুক্তালতা প্রভৃতি লতা গুল্মের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় কয়েকখানি ভজন কুটীর বা বাস গৃহ আছে। এখান হইতে যাত্রা করিতে অর্দ্ধক্রোশাধিক দূরে পেটার নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে শঙ্কর কুণ্ড নামক একটী কুণ্ড এবং চতুর্ভুজধারী ভগবান্ মূর্ত্তি আছে। এখান হইতে আবার ক্রোশ খানেক দূরে একটী স্থানে মহাপ্রভুর বৈঠক এবং দাউজী অর্থাৎ বলদেবজীর স্থান আছে। এখান হইতে আবার অর্দ্ধ ক্রোশাধিক দূরে গোবিন্দ কুণ্ড। এই নির্জ্জন প্রদেশে কয়েকজন সাধু মহান্তের ভজন কুটীর এবং শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ এবং এই স্থানেই পরম ভগবৎ মাধবেন্দ্র পুরীর গোফা অর্থাৎ পুরী গোঁসাই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া যে গোফায় ৺গোপাল দেবকে আবিষ্কার করেন, সেই গোফা আছে। এখান হইতে আন্দাজ একমাইল দূরে পুছরী নামক স্থান। এখানে অপ্সরাকুণ্ড এবং কৃষ্ণকুণ্ড নামক পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইটী সুদৃশ্য কুণ্ড এবং দাউজী ও অপ্সরাবিহারী নামক প্রতিমা আছে। এ স্থানটীও বেশ নির্জ্জন, এখানে একদিন যাত্রা থাকে। এই পরিক্রমণের দুইটী রাস্তা আছে, একটীতে পাঁচক্রোশ চলিতে হয়; আর দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন করিয়া যাইতে

* বঙ্গদেশে নাট্যাদি ক্রিয়াকে যেমন যাত্রা বা নাটক বলে; এখানে সেইরূপ সমুদয় লীলানুকরণ করাকেই রাসলীলা বলে।

এখান হইতে ক্রোশ খানেক কি দেড় ক্রোশ দূরে জ্যোতিঃপুরা নামক স্থানে আসিয়া যাত্রা এক সপ্তাহ স্থিত হয়। এখানে হারজী কুণ্ড, ঐরাবত কুণ্ড, এবং কদম্ব খণ্ডী নামক তিনটী কুণ্ড এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এবং শ্রীগোপালদেবের ছোট ছোট কয়েকটী প্রতিমা আছে। এই স্থানটী গিরিরাজের ক্রোড়দেশ সংলগ্ন প্রশস্ত এবং শান্তিময় প্রদেশ। জগদীশ্বরের অপার কৃপায় আমরা এখানে বাস করিবার জন্য একটী মৃত্তিকার গোফা * প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই নির্জ্জন স্থানের নীরব গোফায় একটী ব্রজবাসিনী রমণী সাধন করেন। এই রমণী গৃহস্থ সংসারী রমণী। ইনি দিবসে দুইবার নিজ ভজনাগারে আসিয়া ভজন করেন, প্রভাতে প্রাত্যহিক স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক গৃহ হইতে আসিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত গোফায় থাকেন, পরে গৃহে গমন করেন। আবার বেলা চারিটা বাজিলে পুনরায় গোফায় আসিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ভজন করিয়া পুনরায় গৃহে গমন করেন। এই গোফাটী দ্বিতল; তিনি উপরে থাকিতেন এবং দয়া করিয়া নিম্নে আমাদের থাকিবার স্থান দিয়াছিলেন। আমরা এই অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে বাস করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলাম। এই শান্তিময় প্রদেশে আসিয়া সকলেই পরমানন্দে ছিলেন। গৃহস্থ যাত্রীদল রাসলীলাদি ক্রিয়াতে আনন্দ লাভ করিতেছেন, সাধু মহান্তগণ ধুনী জ্বালাইয়া প্রায় সারারাত্রি ভজন গীতি গাহিতেছেন, নগরবাসিগণ আনন্দ উৎসব দর্শন করিতে বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ার্থ মহোচ্ছাসে যাতায়াত করিতেছেন, শান্তিরক্ষকগণ উল্কা জ্বালিয়া "যাত্রীদল হুঁসিয়ার" রবে হল্লা করিয়া চারিদিকে পাহারা দিতেছে; এই সকল কোলাহলের মধ্যেও এ স্থানটী যেন গম্ভীর নির্জ্জন। আমরা রজনীতে আমাদের গোফার বাহিরে আসিয়া গিরিরাজের দিকে চাহিয়া যখন বসিয়া থাকিতাম, তখন আমাদের এত যে চঞ্চল মন, সেও ক্ষণেকের জন্য স্থির ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। আমরা এত যে নিদ্রা আলস্যের বশীভূত; তবু সেরূপ সময়ে নিদ্রা আলস্য যেন কোথায় পলাইয়া যাইত।

এই সপ্তাহের মধ্যে গোঁসাইরাজের রাসধারিগণ এখান হইতে কিয়দ্দূর স্বর্য্যকুণ্ড নামক স্থানে এবং গোলাল কুণ্ডে যাইয়া যখন রাসাদিলীলা করে, তখন গোঁসাইরাজ নিজে রাসধারী সাজিয়া থাকেন এবং তাঁহার শিষ্যশিষ্যাণীগণ তাঁহার সহিত গোলাল অর্থাৎ আবির খেলিয়া থাকে। গোলাল কুণ্ডে যাইয়া এই হোলিখেলা হইয়া থাকে। গোলাল কুণ্ডের স্থানটীও পরম নির্জ্জন শান্তিময় স্থান। এই স্থানের অনতি দূরে যেখানে গিরিরাজের উপরে শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর গোপালদেব আছেন, সেই স্থানটীর নাম গোপাল নগর। গোপাল এই নগরে রাস করেন। একদিন এই গোপাল নগরে

* গিরি-গহ্বরকে এখানকার লোক গোফা বলে।

গিরিরাজের মুখারবিন্দ নামক স্থানে পুরী, কচুরী, পেঁড়া, বরফি, পুয়া, ক্ষীরসা প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্নের স্তূপ করিয়া গিরিরাজের ভোগ দেওয়া হয়। এই ভোগের উৎসব দর্শন করিতে বড় আনন্দ। রঙ্গিন বস্ত্র কর্ত্তন করিয়া শ্রীনাথজীর আকারে প্রস্তুত করা হয় এবং সেই বস্ত্র গিরিরাজের গাত্রে লটকাইয়া দিলে সেই সেই কর্ত্তিত স্থানের মধ্য দিয়া সুচিকণ গিরিরাজের ঘন শ্যামবর্ণ হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গ প্রকাশিত হইয়া সুন্দর প্রতিমা মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। পরে চন্দনাদি দ্বারা চক্ষু নাসিকাদি এবং বিবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং তথায় বৃহৎ ফুল বাংলা অর্থাৎ ফুলের দ্বিতল ত্রিতল সৌধ, চৌতারা, মঞ্চ, বারান্দাযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। সেই অতি সুন্দর পুষ্প মন্দিরের মধ্যে শ্রীনাথজীর মনোহর মূর্ত্তি এবং চারিদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন হাঁড়ি, টোকরা প্রভৃতি পাত্রে স্তরে স্তরে সাজান এবং লাল, নীল, শ্বেতাদি বর্ণের আলো ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করে। আহা! সেই নবজলধর-নিন্দিত গিরিরাজস্থিত শ্যামল তমালাদি তরুরাজি-বিকীর্ণ নীরব শান্তিময় প্রদেশের এই পরমানন্দের মেলা বড়ই আনন্দ-কর। এই মেলা দর্শন করিতে যাত্রিগণ ভিন্ন অনেক ব্রজবাসী ব্রজবাসিনীগণ আসিয়া থাকেন। ব্রজবাসিনীগণ শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া গিরিরাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দেববালার ন্যায় বিরাজ ও বিবিধ সঙ্গীত গান করেন। সে সৌন্দর্য্যও বর্ণনাতীত।

এই মেলার পরদিন ভোগের দ্রব্যাদি লইয়া সকলে মিলিয়া বনভোজনানন্দ করেন। সেই বনভোজনের বা আনন্দ কত! সহস্রাধিক যাত্রী, আরো গ্রামবাসী লোক সকল মিলিত; কেবল "খাও খাও, লও লও" শব্দ ভিন্ন আর অন্য কথা নাই। এইরূপ এখানে সপ্তাহ কাল বাস করিয়া এ যাত্রা আবার গোবর্দ্ধন নামক স্থানে না গিয়া এই স্থান হইতে একদিনে মানসী গঙ্গা পরিক্রম এবং হরিদেবজী ও চক্রেশ্বর মহাদেবজী দর্শন করিয়া আবার জ্যোতিপুরায় ফিরিয়া আসে। রাজার যাত্রী গিরিরাজ পরিক্রমণ করিয়া গোবর্দ্ধনে যাইয়া একদিন বাস করিয়া কাঠা বনে যাত্রা করেন। গোবর্দ্ধনের গোপাল নগরের গোপালদেবকে বাঙ্গালী যাত্রী বা সাধু বৈষ্ণব সকল সময় দর্শন করিতে পায় না। কারণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দকে গোবর্দ্ধনের উপর উঠিতে নিষেধ করিয়াছিলেন! তবে প্রতিবৎসর অন্নকূট যাত্রার সময় যখন মহা সমারোহে গোপালদেব ভোগ গ্রহণার্থ নিজ নগরে অবতরণ করেন, তখন সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

ধ্যান।

(গুহক-মিলিত রাম)।

চণ্ডালার্ভকদত্তবন্যকুসুমালঙ্কারধারী শিশুঃ
সানন্দং গুহকাঙ্গনির্ভরপরীরম্ভোচ্ছলৎসৌহৃদঃ।
নৃত্যদ্ভিঃ পরয়া মুদা সপুলকৈঃ প্রেমাশ্রুসিক্তাননৈঃ
চণ্ডালৈঃ পরিবারিতোঽধমগতির্ধ্যেয়োরঘূণাং পতিঃ॥

চণ্ডাল-বালকগুলি নানা বনপুষ্প তুলি
কোমল শ্যামল দেহ দেছে সাজাইয়া ;
মিলিত গুহক-সনে গাঢ় প্রেম-আলিঙ্গনে
সখ্য-রসে হিয়া যেন পড়িছে গলিয়া।
যতেক চণ্ডাল তায় হর্ষে পুলকিত কায়
প্রেমাশ্রুধারায় সিক্ত সবার বদন ;
যে যথা চণ্ডাল আছে দুটী বাহু তুলে নাচে
স্মর সেই রঘু-শিশু অধম-তারণ।

(জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম)।

শ্রীক্ষেত্রপ্রেমসিন্ধৌ বিলয়গতজগজ্জাতিভেদে বসন্তং
জ্ঞানং প্রেম্না চ ভক্ত্যা মিলিতমিব সদা রাম-ভদ্রা—সমেতম্।
প্রেম্নৈকত্র শ্বপাকৈঃ সহ ধরণিসুরা ভুঞ্জতে যৎপ্রসাদং
ধ্যায়েদীশং তমাস্যচ্ছবিভুবনজনোন্মোহনং রত্নমঞ্চে॥

শ্রীমন্দিরে রত্নমঞ্চে প্রভু জগন্নাথ
বিরাজেন বলরাম—সুভদ্রার সাথ ;
একাসনে তিন মূর্ত্তি কর দরশন,
একাধারে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের মিলন ;
প্রেম সিন্ধু শ্রীক্ষেত্রের তুলনা না পাই,
প্রেমের মিলনে যথা জাতিভেদ নাই ;
প্রেমময় প্রভুর প্রভাব চমৎকার!
নাহি হেথা ভেদাভেদ, নাহিক বিকার ;
ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল—নর-নারী প্রেমে মিলি
এ দেয় উহার মুখে অমৃতান্ন তুলি ;
মরি কি শ্রীমুখ-কান্তি ভুবনমোহন।
ধ্যান কর জগন্নাথ পাতকি-তারণ।

(ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব)।

মৃত্যুব্যাধিজরাধিজর্জ্জরজগন্নির্ব্বাণদীক্ষাগুরুঃ
সান্দ্রধ্যানলয়ঃ স্থিরাক্ষিকমলোনির্ব্বাতদীপচ্ছবিঃ।
জানুন্যস্তকরঃ স্বদেহমহসাশেষাদিশোভাসয়ন্
ধ্যেয়ঃ শান্তি-বিবেক-মূর্ত্তিরনিশং শ্রীবুদ্ধদেবো হৃদি॥

জরা-মৃত্যু রোগ-শোকে জীব জরজর,
হেরি' উথলিল যাঁর করুণা-সাগর ; (১)

(১) তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া লোকসমাজ যখন অজস্র জীবহত্যা, সুরাপান ও ব্যভিচারাদি পাপের প্রবল স্রোতে উচ্ছলিত ; যখন নরবলি ও নরমাংসভক্ষণও ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠিত হইত, সেই সময় ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারে সেই পাপস্রোতের গতিরোধ করিয়াছিলেন। অহিংসা ও করুণার মূর্ত্তি বুদ্ধদেব কপিলবস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্ম ও কর্ম্ম সকলি অলৌকিক। অহরহঃ জীবগণের শোক—মোহ—জরা—ব্যাধি—মরণাদি যাতনা দর্শনে নবযৌবনেই ইহাঁর বৈরাগ্যোদয় হয়। ইনি রাজ্য—দারা—ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহস্র বিঘ্ন—বাধা—প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, জীবগণের জন্য নির্ব্বাণ-পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবিদ্যাই জীবের সর্ব্ব দুঃখের মূল ; বিবেকই নির্ব্বাণের পথ। অহিংসা, করুণা প্রভৃতির সাধনায় চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হইলে বিবেকোদয় হয়। ইহাই তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের সার

তাই যিনি জীবে দিতে নির্ব্বাণ অভয়,
রাজ্য, দারা, সুত, আদি ছাড়ি সমুদয়,
নিমগ্ন গভীর ধ্যানে, ইন্দ্রিয় নিশ্চল,
সে ধ্যানে পাইল লয় এ বিশ্বমণ্ডল ;
স্পন্দহীন দেহ, স্থির যুগল লোচন,
নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ-সম দরশন ;
জানু'পরি স্থাপিত লোহিত করতল,
স্বর্ণ পীঠে শোভে যেন রক্ত শতদল ;
উপবিষ্ট তরুমূলে পুণ্য বেদিকায়, (২)
উজলিছে দশদিক্ বরাঙ্গ-বিভায় ;
অহিংসা-শান্তির মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ নির্ব্বাণ,
জ্ঞানময় বুদ্ধদেব সদা কর ধ্যান।

মর্ম্ম। গভীর সাধনায় তিনি স্বয়ং নির্ব্বাণ লাভ করেন এবং অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলীকে নির্ব্বাণ দান করিয়া যান।

"প্রক্ষাল্য ত্রৈলোক্যমলং মলীমসং
প্রবৃদ্ধহিংসারসদূষিতং বিভুঃ।
প্রবোধধারাধরভূরিবারিভিঃ
ররাজ দেবো ভুবি বোধভাস্করঃ॥"

ভগবান্ বুদ্ধ প্রবোধরূপ মেঘ হইতে অজস্র শান্তি-বারি-বর্ষণে, প্রবল হিংসারসে দূষিত মলিন জগতের পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া, ভূলোকে জ্ঞানময় সূর্য্যরূপে প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন।

(২) বুদ্ধদেব গয়ার যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাকে 'বুদ্ধগয়া' বলে। তথায় যে অশ্বথ-তরু-মূলে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, সেই তরুর নাম 'বোধিদ্রুম।' বুদ্ধগয়ায় সেই প্রাচীন তরু-মূলের কিয়দংশ অদ্যাপি বিচ্ছিন্নাবস্থায় পতিত আছে। তথায় বুদ্ধের অপূর্ব্ব মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ স্থানে চির-শান্তি বিরাজিত। স্থানটীর এমনি প্রভাব যে, তথায় গমন করিবামাত্র সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হয়, ইন্দ্রিয় সকল শান্তিদেবীর অমৃতময় ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে ; আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। জগতে বুঝি এমন পুণ্যক্ষেত্র আর নাই।

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয়া মহারাণী বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা বর্ত্তমান জর্ম্মণ সম্রাটের জননী এম্‌প্রেস ফ্রেডরিক বহুদিন উদর রোগ ভোগ করিয়া মাতৃদেবীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা ইঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন্।

২। ট্রান্সভাল বিজয়ী লর্ড রবার্টস ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

৩। ভূমিকম্প নানাস্থানে হইয়াছে। দিনাজপুরে ইহা ৪ মিনিট কাল ছিল। সিলেট ও রঙ্গপুরে ইহা ভয়প্রদ হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও অল্পাধিক হইয়াছে।

৪। সহমরণের সংবাদ ক্রমাগত শুনা যাইতেছে, ঢোলপুরের মহারাণী স্বামীর সহমৃতা হইয়াছেন। হাজারীবাগের বাবু ব্রজেন্দ্রলাল রায়ের স্ত্রী এবং মেদিনীপুরের বাবু দীননাথ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহাদেরও শব স্বামি-শবের সহিত এক চিতায় ভস্মসাৎ হইয়াছে।

৫। ২১এ শ্রাবণ মহাকালী পাঠশালার ৭ম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। দ্বারবঙ্গের মহারাজা সভাপতির কার্য্য করেন।

৬। মহাবোধিসভা কলিকাতায় একটী পালি ভাষার শিক্ষালয় ও অনাথাশ্রম সংস্থাপন করিতেছেন।

৭। মিসর যুদ্ধাবসানে (১৮৮২ সালে) আরাবী পাশাকে সিংহলে বন্দী রাখা হইয়াছিল, আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৮। লাহোরের বৈদিক বিদ্যালয়ে ৫০ জন মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা সুসংবাদ।

৯। এতদিনের পর ৪টী অতিরিক্ত ছাত্র 'বি এ' পাস হইয়াছে। তাহাদের নম্বর তুলিবার ভুল হইয়াছিল।

১০। বেথুনের পঞ্চাশৎ বার্ষিক সমাধি উৎসবে বেথুন কলেজের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা উপস্থিত হইয়া শোকগাথা পাঠ ও সঙ্গীত করেন। যে কবিতা পঠিত হয়, তাহা বামাবোধিনীতে দৃষ্ট হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

অশোকা—শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী বিরচিত, মূল্য ১॥০ টাকা। গ্রন্থকর্ত্রী নূতন লেখিকা নহেন, ইহাঁর প্রণীত "হাসি ও অশ্রু" ইহাঁর কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তক খানি তাঁহার স্বর্গগতা দুহিতা "অশোকার" স্মৃতি-নিদর্শন। ইহার উৎসর্গ-কবিতা পাঠে হৃদয় বিগলিত হয়—পরে সেই শিশু কন্যা স্বর্গের দূতের ন্যায় চিত্রাঙ্কিত ও কবিতাঙ্কিত ছবিতে পবিত্রতা ও কোমলতা ছড়াইয়া হৃদয় প্রাণকে মুগ্ধ করে। কবির হৃদয় কন্দরের কত বিচিত্র ভাব শত শত নির্ঝরের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া এই কাব্য সরোবরকে পূর্ণ করিয়াছে! কখনও বাল্যস্মৃতি, কখনও যৌবনের প্রণয়োচ্ছ্বাস, কখনও স্বভাবের কোনও সুন্দর দৃশ্য, কখনও জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনা, কখনও কোনও ইতিহাস বা কাব্যনাটকের কোনও মহৎ চরিত্র উপলক্ষ করিয়া কবিতা ধারা বহিয়াছে! ইহাতে আনন্দ, বিস্ময়, ভয়, শোক সকল ভাবেরই অবতারণা হইয়াছে; কিন্তু সকলের প্রধান ভাব বিষাদ। কবি যেন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ঘন কাল জমীর উপর বিচিত্র বর্ণের চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। স্থানের অল্পতা বশতঃ আমরা কবিতার নমুনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পুস্তকে অনেকগুলি বিদেশীয় উৎকৃষ্ট কাব্যের বঙ্গানুবাদ আছে, তাহাতে লেখিকার পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাঁর দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার আরও অলঙ্কৃত ও পরিপুষ্ট হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

২। ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন চরিত ও কবিতাবলী—শ্রীরামময় চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। সংস্কৃত কলেজ পূর্ব্ব যুগে যে কয়েকটী পণ্ডিত রত্ন দ্বারা উজ্জ্বল-সুখশ্রী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তর্কবাগীশ মহাশয়

একজন। ইনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সুছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, পরে সাহিত্যাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বহু ছাত্রকে মানুষ করিয়াছেন। ইনি যেমন অগাধ বিদ্যাশালী, সেইরূপ সুকবি এবং সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর রচিত অনেকগুলি সুন্দর কবিতা জীবনচরিত গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাঁর উদারহৃদয় ও মহৎচরিত্রের অনেক উদাহরণও ইহাতে বর্ণিত আছে। ইহাঁর লোকান্তরের পর ইহাঁর স্থান অপূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ গুণবান্ ব্যক্তির জীবন-চরিত পাঠে সকলেই লাভবান্ হইবেন সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

নহে।

নহে এ জীবন নহে মিথ্যার স্বপন,
নহে জলবিম্ব মত দুদণ্ডের খেলা।
কালের প্রবাহে ভাসে জীর্ণ তরী মত,
দুদণ্ডে কাটিয়া যাবে জীবনের বেলা।
দেখ পশি অন্তরের গভীর গুহায়,
কি অনন্ত তৃষা জাগে দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার।
কোন্ মহাসিন্ধু পানে ও তটিনী ধায়,
কি আলোকে পূর্ণ সদা আঁধার আগার?
শুন ওই সুপ্রগাঢ় নিরাশার মাঝে,
কি গভীর আশা-বাণী হতেছে ধ্বনিত।
কি আনন্দ বীণা সদা পরাণেতে বাজে,
করি এ হৃদয় সরঃ চির উচ্ছ্বসিত।
অনন্ত পিপাসা-পূর্ণ এ মহা নির্ঝর,
শুখাতে কি মরুমাঝে হয়েছে সৃজিত?
পরিপূর্ণ বাসনার এ দীপ্ত প্রদীপ,
জ্বলি কি মুহূর্ত্ত তরে, হবে নির্ব্বাপিত?
জেনো জেনো এই মহা আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুর,
হয়নি রোপিত মিথ্যা মানব-আত্মায়।
অনন্ত জীবন তরে প্রাণ তৃষাতুর,
ছয় নাই মরিবারে করি হায় হায়!!

লজ্জাবতী বসু।

কি চাহিব?

না চাহিতে সবি পাই,
বল, কি চাহিব আর?
বুকভরা আশা আছে,
নয়নেতে অশ্রুধার।
হৃদে আছে ভক্তি-নদী,
আরো আছে হাহাকার;
পুরাতে প্রাণের তৃষা,
দে'ছ প্রেম পারাবার।
পূর্ণিমায় স্নিগ্ধ রেতে,
দিয়েছ অমৃত রাশি,
অন্ধকার অমানিশা—
বসন্তে ফুলের হাসি।

প্রকৃতির মধুরিমা,
নির্ঝরের বারি-ধার ;
কি চাহিব তোমা কাছে'
এ হতে সুন্দর আর ?
বিরহ, বিচ্ছেদে যবে,
ভেঙ্গে চুরে যায় প্রাণ,
সঙ্গীতের সুধা দেহ,
গাহিতে পবিত্র নাম।

পিতা, মাতা, ভাই, বোন,
সবিত পেয়েছি নাথ !
ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম,
তাওত তোমারি হাত।
চারিদিকে চাই, হেরি
অভাব কিছুই নাই ;
অন্তিমে এ ভিক্ষা মাগি,
যেন মা তোমারে পাই।

শ্রীমতী—

তুমি কোথায় ?

কোথায়—কোথায় ?
অতল জলধি-নীরে,
অথবা পর্ব্বত-শিরে,
কোথা অন্বেষিলে প্রভু পাব গো তোমায়,
কোথায় রয়েছ তুমি কোথায় কোথায় ? ১

কোথায়—কোথায়,
তরু গুল্ম লতা আদি
এ সবে থাকগো যদি,
দয়া করে বল মোরে খুঁজিব তথায়,
কোথায় রয়েছ তুমি কোথায় কোথায় ? ২

কোথায়—কোথায়,
সরোজেতে কুমুদেতে
খুঁজি যদি তোমা পেতে,
তাহলে তুমি কি দেখা দিবে গো আমায়,
কোথায় রয়েছ প্রভো ! কোথায় কোথায় ? ৩

কোথায়—কোথায়,
দরিদ্রের জীর্ণ ঘরে
নৃপতির সৌধ পরে,
অথবা কান্তারে দেখা পাইব তোমায় ?
কোথায় রয়েছ প্রভো কোথায় কোথায় ? ৪

কোথায়—কোথায়,
নিদাঘে রবির তাপে
যদি এ পৃথিবী তাপে,
চেয়ে যদি থাকি প্রভো দেখা কি গো যায় ?
কোথায় রয়েছ তুমি কোথায় কোথায় ? ৫

কোথায়—কোথায়,
পরিপূর্ণ বরষায়
নিশা আর দিবসের
অবিশ্রান্ত বারি পাতে পাব কি তোমায়,
কোথায় রয়েছ তুমি কোথায় কোথায় ? ৬

কোথায়—কোথায়
অন্বেষিলে তোমা আশে
শরতের নীলাকাশে,
দেখা দিবে কি গো তুমি আমারে সেথায়,
কোথায় রয়েছ প্রভো কোথায় কোথায় ?৭

কোথায়—কোথায়,
হেমন্ত শীতের কালে
নিবিড় কুহেলী-জালে
ঢাকে যবে চারিদিক্ কিছুই না দেখা যায়,
তুমি কি সে অন্তরালে বল গো বল আমায় ?

কোথায়—কোথায়
মধুর বসন্ত কালে
বসিয়া গাছের ডালে
কোকিল যখন ডাকি ভুবন মাতায়,
সে মধুর তান মাঝে পাব কি তোমায় ? ৯
শুধু বল দেব তুমি রয়েছে কোথায়,
কোথা—কোন্ দেশে খুঁজি পাইব তোমায় ?
ত্রিভুবনবাসী সবে তোমারেই চায়।
তুমি দেব ভব-ধব,
প্রণমি চরণে তব,
শোক তাপ দূর হয় তোমার পূজায়।

তুমি পিতা তুমি মাতা
তুমি বন্ধু জ্ঞান দাতা,
তুমি সকলিত মোর এ প্রাণ তোমারে চায়।
তোমার চরণ স্মরি,
বিনয়ে প্রণাম করি,
উদয় হইবে কবে আমার হিয়ায় ?
যে ভাবে যথায় থাক,
চিরদাসী করে রাখ,
স্থান দেও মোরে প্রভু চরণ ছায়ায়।

নগেন্দ্রবালা বসু,
বীরভূম।

বিক্টোরিয়া পারিতোষিক রচনা ফণ্ড।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার স্মরণার্থ ৫টী পারিতোষিকের জন্য (প্রত্যেকটীর ১০৲ করিয়া) ৫০৲ টাকার প্রয়োজন। বামাবোধিনীর নিজের অবস্থা পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। সহৃদয় বন্ধুগণের সাহায্যের উপর ইহার অনেক আশা ভরসা। বামাবোধিনীর জুবিলী উপলক্ষে পারিতোষিক রচনা ফণ্ডে অনেক হিতৈষী বন্ধু যেরূপ কিছু কিছু আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ফণ্ডেও সেরূপ করিবেন আশা করিতে পারি।

রচনার বিষয়।

১। মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবন হইতে কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়।
২। মহারাণী রমণীকুলের আদর্শ ও গৌরব।
৩। আদর্শ রাজ্ঞীদিগের মধ্যে মহারাণীর স্থান কোথায় ?
৪। মহারাণীর নর-জীবন ও অমর জীবন।
৫। রমণীর সাম্রাজ্য প্রেমের রাজ্য।

পারিতোষিক রচনা প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত দেড় মাস সময় দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই ভাদ্র তারিখ পর্য্যন্ত তাহা গৃহীত হইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
১৩০৮। ১লা ভাদ্র।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
সহ-কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRICA

“कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৯ বর্ষ। ৪৪১-৪২ সংখ্যা। | আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৮। | ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—যুবরাজ ডিউক অব কর্ণওয়াল সস্ত্রীক “কেপটাউন” দর্শন করিয়া স্থানীয় সর্ব্বসাধারণের রাজভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের “চান্সেলর” হইয়াছেন। বুর যুদ্ধের আন্দোলনের মধ্যেও ডচ্ প্রজাবৃন্দ অচল রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছে। রাজদম্পতী কানাডা যাত্রা করিয়াছেন।

বুরযুদ্ধ—শীঘ্র ইহার অবসান হয়, এইজন্ত বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের মত লইয়া লর্ড কিচনার এক ঘোষণা পত্র দিয়াছেন যে বুরদিগের সেনাপতি সৈন্ত প্রভৃতি যাহারা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করিবে, তাহারা বিদ্রোহীরূপে গণ্য হইয়া বিদ্রোহীর উপযুক্ত দণ্ড পাইবে। বুরদিগের সৈন্তসংখ্যা এখনও প্রায় ১৪ হাজার এবং তাহারা প্রাণপণে লড়িতেছে, সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে বোধ হয় না।

অনৈক্য ভারতের সর্ব্বনাশের মূল—ভারতের ধন জন ও অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতে ইহার পতন হইল একমাত্র ভারত-সন্তানদের পরস্পর ভেদ-বুদ্ধিতে। এখন পরাধীন হতভাগ্য ভারতবাসীদের যাহা কিছু লাঞ্ছনা ও দুর্গতি বাকী আছে, তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্ত সেই ভেদ-বুদ্ধি জাতিভেদ আকারে সহস্র শীর্ষ উত্তোলন করিয়াছে। কায়স্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত্ত, বেণিয়া, তাঁতী, তেলী, সুগী সকলেই আপনার জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন জন্ত শশব্যস্ত। ইহাতে লাভ কেবল শক্র-হাসান এবং পরস্পরের অনিষ্টসাধন। এ স্থলে মহাত্মা চৈতন্তের উপদেশই

সকলের শিরোধার্য্য "অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" ইহাতেই ঐক্য বন্ধন ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

জমিদার সভা—প্রাচীন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিতে না পারাতে মফঃস্বলের জমীদারগণ মিলিয়া এক নূতন জমীদার সভা কলিকাতাতেই স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও ইহাতে যোগ দিয়াছেন।

নূতন যুদ্ধ সূচনা—তুরস্কের সুল-তানের সহিত ফরাসীদের মনোবাদ উপস্থিত হওয়াতে পরস্পরের বাহুবল পরীক্ষার উদ্যোগ হইতেছে। শীঘ্র সন্ধি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা মহাপ্রলয় কাণ্ড ঘটিবে।

বঙ্গের শিল্পোন্নতির আশা—পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে কয়লা ও লৌহের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একজন শিল্পজ্ঞ এই ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ শীঘ্র বিলাতের "কার্ডিফ" বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূ-পর্য্যটক বাঙ্গালী—ডাক্তার শরচ্চন্দ্র মল্লিক বিলাতে শিক্ষিত ডাক্তার, লণ্ডনের হাঁসপাতালের কার্য্যে তিনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং লণ্ডনে বড় বড় ইংরেজ ডাক্তারের ন্যায় তাঁহার পসার। ওয়েষ্ট মিনষ্টারে ইংরাজ ও দেশীয়দের এক সভা হইয়া তাঁহাকে ভূ-প্রদক্ষিণার্থ বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট-সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার প্রশংসাসূচক এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া দেশীয়দিগের প্রদত্ত তাঁহার প্রতিকৃতি তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। বিলাতে ১৯০২ সালের "কন্‌গ্রেস" বসাইবার জন্যও ডাক্তার সচেষ্ট।

ছোট লাটের সুকীর্ত্তি—হোটেল ও শুণ্ডিকালয়ে স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী থাকাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় হইয়া থাকে। ছোটলাট এ প্রথা রহিত করিয়া ভদ্রসমাজের ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন।

রাজ-সম্মিলন—রুসিয়ার জার ফ্রান্সের সৈন্যপ্রদর্শনী দর্শনার্থ ডঙ্কার্ক নগরে ফরাসী প্রেসীডেণ্ট লুবের সহিত সম্মিলিত হইবেন; পথে ডাণ্টজিগ নগরে জর্ম্মণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। রিম্‌দ নগরে আর এক মহাসৈন্য প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে রুসিয়েশ্বরী আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিবেন।

পার্লেমেণ্ট বন্ধ—রাজা ৭ম এডওয়ার্ড এক বক্তৃতা করিয়া পার্লেমেণ্ট বন্ধ করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল প্রধান রাজ্যের সহিত ইংরাজদের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে, ইহাই বক্তৃতার সার।

রাজস্বের উন্নতি—গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দেড় কোটি টাকা বাড়িয়াছে।

বুদ্ধ গয়ায় বৌদ্ধ অধিকার—বুদ্ধ গয়ায় যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম উপদেশ দেন, সেই স্থানটী বৌদ্ধেরা ৬০০ টাকায় কিনিয়াছেন। মহাত্মা ধর্ম্মপালের মাতা শ্রীমতী মল্লিকা এই অর্থ দান করিয়াছেন।

মুক বধির বিদ্যালয়—কলিকাতার

...নী ...০ টাকা ...ওয়া হইয়াছে ... ভূমি ক্রয়ার্থ গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ আরও অর্থের প্রয়োজন, বদান্য মহোদয়গণের সাহায্যের উপর নির্ভর।

স্ত্রীলোকের চাকরী—দিন দিন স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত ও তৎসঙ্গে উপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইতেছে দেখিয়া, আমরা আনন্দিত হইতেছি। মহীশূরের মহারাণীর মহিলা-বিদ্যালয়ের দুইটী ব্রাহ্মণ বালিকা মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে রাজসরকার হইতে দেড়শত টাকা করিয়া বেতন পাইতেছেন।

মৃত্যু—(১) গত ২৫এ আগষ্ট দার্জিলিঙে বহুমূত্র ও ক্ষয়কাশ. রোগে খ্যাতনামা ডাক্তার এম এম বসুর দেহাত্যয় ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়স্থান হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গত ২০ বৎসর কাল কলিকাতা নগরে যেমন চিকিৎসা কার্য্য করিতেছিলেন, সেইরূপ একটী হোমিওপাথী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা চালাইয়া আসিয়াছেন। ইনি নির্ম্মলচরিত্র ও বহুগুণে বিভূষিত ছিলেন এবং বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা সংক্রান্ত ও দেশহিতকর সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বামাবোধিনী ইহাঁর নিকট বিশেষ ঋণী। কয়েক বৎসর ইহার ইংরাজী স্তম্ভের ভার লইয়া এবং ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইহার উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়াছেন। মঙ্গলময় ইহাঁর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন এবং ইহাঁর অনাথিনী বিধবা ও অনাথ পুত্র ৩টীর জীবনের চির-সহায় হউন, আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে এই প্রার্থনা করিতেছি।

(২) কটক রাবেন্‌সা কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদারের বহুমূত্র রোগে অকাল মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ইনিও এদেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। শান্তিদাতা তাঁহার শান্তিক্রোড়ে রাখিয়া ইহাঁকে শীতল করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

[শ্রীম—কথিত]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব প্রথমে খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন বোধ হইল।

ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় ঠিক্ সহজাবস্থা।

("আমি সিদ্ধি খাব")।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবাবস্থা) মা! আমি কারণানন্দ চাই না। আমি সিদ্ধি খাব।

(গীতা ও অষ্টসিদ্ধি)।

"সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি নয়। সে (অনিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'ভাই যদি দেখ যে অষ্টসিদ্ধির একটী সিদ্ধি কাহারও আছে, তা'হলে জেনো যে, সে, ব্যক্তি আমাকে পাবে না।" কেননা, সিদ্ধি থাকিলেই অহঙ্কার থাকিবে, আর অহঙ্কারের লেশ থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

(ঈশ্বর লাভ কি ?)

"আর এক আছে, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের-সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে প্রবর্ত্তকের থাকে। সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে আচার করে। যে ব্যক্তি সাধক, সে আরো এগিয়ে গেছে। লোক-দেখানো ভাব কমে গিয়েছে। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে ? যার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'রছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'রেছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ কে ? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ

সিদ্ধ [illegible]
সখ্যভাবে, [illegible]
আলাপ করে। [illegible]
আছে,' এই বিশ্বাস এক রকম, আর [illegible] থেকে আগুন বার করে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করা আর এক জিনিষ।

'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তার বাড়া, তার বাড়া আছে!

(ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকার-বাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) তারা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী, তা বেশ। (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে, নয় নিরাকারে। দৃঢ় হ'লে তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'রবে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'রবে। মিছরীর রুটী সিদে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্ট লাগবে। (সকলের হাস্য)।

(বিষয়ীর ঈশ্বর; ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ)।

"কিন্তু দৃঢ় হতে হবে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান ? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য।' আর যেমন কোন ফিট্ বাবু পান চিবুতে চিবুতে, হাতে ষ্টিক্ (Stick) করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর কি Beautiful (সুন্দর) ফুল ক'রেছেন।' কিন্তু এই বিষয়ীর

ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

'তাই বলছি, একটার উপর দৃঢ় হ'তে হইবে। ডুব দাও, ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতরে রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।'

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

গীত।

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার
সে কোন্ জন?
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা হয় কেন?

'সবলোক বাবুর বাগান দেখে অবাক্ —কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি—তাই সব দেখে অবাক্; কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে কজন? বাবুকে খোঁজে দুই একজন। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁর দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক'চ্চি। সত্যি বলছি —একথা কারেই বা বল্‌ছি, কেবা বিশ্বাস করে!!

(শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ Revelation ;)

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সব সন্দেহ দুর হয়। কই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পাবে না।

"শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব—তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবে না। যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা কর। কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

(ব্রাহ্মসমাজ, সাম্য ও ঈশ্বরের 'বৈষম্য দোষ')।

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশি আর একজনের উপর কম? তা'হলে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! ঘোড়াটাও, টা-আর সরাটাও, টা! তুমি যা ব'লছো,

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। বলেছিল, "মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়াছেন, কারুকে কম দিয়াছেন ?" আমি বল্লাম বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরে যেমনি, পীপড়েটার ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসেছি ? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি ! তা নয় তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে, সে একলা একশ লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, এক জনের ভয়ে পলায়।

"যদি শক্তি বিশেষ না হয়, তা'হলে লোকে কেশব সেনকে এত মান্‌তো কেন ? "গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা Lecture দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরে বিশেষ শক্তি আছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। (সদরওয়ালার প্রতি) মহাশয়, ইনি যা বলচেন, মেনে নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্ম-ভক্তের প্রতি) তুমি কি রকম লোক ! কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া যে কপটতা। তুমি ঢং—তুমি কাচ্ দেখছি। ব্রাহ্মভক্তটী অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

(ব্রাহ্ম সমাজ, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও নির্লিপ্ত-সংসার ; সংসার ত্যাগ)।

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ করতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে ? সংসারে থেকেই হতে পারে। তবে আগে দিনকতক নির্জ্জনে থাকতে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। এমন একটী বাড়ীর কাছে আড্ডা করতে হয়, যেখান থেকে বাড়িতে এসে অমনি আবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ এরা সব বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনকরাজা মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর, তবেত জনকরাজা হবে। অমুক খুব তর্ তর্ তর্ তর্ করে ইংরাজি লিখতে পারে, তাকি একবারেই লিখ্‌তে পেরেছিল ? সে গরিবের ছেলে, আগে এক জনের বাড়িতে শিখেছিল, তাই এখন তর্ তর্ করে লিখতে পারে।

"কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সারবে কেমন করে ? রোগটী হয়েছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরে

আচার তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার তেঁতুল এই দেখ, বলতে বলতে আমার মুখে জল এসেছে, সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই ত জান। মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে (সকলের হাস্য)। এই আচার তেঁতুল, মনে করলে মুখে জল সরে, কাছে নেতে. হয় না। আচার ভোগ-বাসনা জলের জালা। বিষয় তৃষ্ণার শেষ নাই, আর সেই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁই নাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেথানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাকলে আর কামিনী কাঞ্চনে কিছু করতে পারে না। তথন জনকের মত নির্লিপ্ত হতে পারবে। মেয়েদের মার মত দেখবে, ভগিনীর মত দেখবে।

"কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার হয় না, তথন হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জ্জনে সাধন করে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ ক'রে বল বাড়িয়ে বাড়ী গিয়ে সংসার কর, তা'হলে কামিনী কাঞ্চনে তোমায় কিছু করতে পারবে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাথন তুলতে হয়। জ্ঞান ভক্তিরূপ মাথন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা'হলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায় দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, তা'হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তথন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে পারবে না।

"ঈশ্বর লাভের পর সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধর্‌বে, আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তথন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তাঁর সেবা করবে।

সদরওয়ালা। (আনন্দিত হইয়া) মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি? কিন্তু ঐটী আমরা ভুলে যাই। মনে করি, বুঝি একেবারে জনক হয়ে পড়েছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসারে ত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে; খিদে, তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই ভাল। কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই

পেলে না, তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।

"একজন তার মাগ্‌কে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চল্লুম।' মাগ্‌টী একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে বল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তা'হলে এই এক ঘরেই ভাল।

(ভক্তদের প্রতি) "তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে? বাড়ীতে আরও বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভা'বতে হ'বে না। দারা সঙ্গে, তাতেও দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, তাঁরা জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। তাঁরা দুখান তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্ম্মের।

(জ্ঞানীর লক্ষণ)।

সদরওয়ালা। মহাশয়, জ্ঞান যে হয়েছে, তা কেমন করে জানবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে বোধ হয় না। তিনি আর 'তিনি' বোধ হয় না। তখন 'ইনি'; হৃদয় মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

সদরওয়ালা। মহাশয়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন?

(ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও পাপবাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সদরওয়ালার প্রতি) ঐ কেবল তোমাদের 'পাপ' আর 'পাপ' এ সব বুঝি খৃষ্টানী মত। আমায় একজন একখানা বই (Bible) দিলে, একটু পড়া শুনলুম, তা তাতে কেবল ঐ এক কথা! পাপ আর পাপ! 'আমি তাঁর নাম করেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি বলেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা। মহাশয়, কেমন করে ঐ বিশ্বাস হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে—"প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ তোমারে কি যায় জানা।" যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্যে তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, আর কাঁদ। মাগের ব্যামো হলে, কি টাকা লোকসান হলে, কি চাকরী গেলে লোক এক ঘটী কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি?

(ক্রমশঃ)।

গীতাসার ব্যাখ্যা।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

বিষয় সকল ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই সংযোগ হইতে বিষয় কামনার উৎপত্তি হয়, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্পূর্ণ মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে।

গীতোপদেষ্টা অতি আশ্চর্য্য কৌশলে বিষয় চিন্তার বিষময় ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্প উদ্গত হইয়া অবশেষে ফল উৎপন্ন হয়, তেমনি বিষয়-ভাবনার ক্রমবিকাশের পরিণাম মৃত্যু। বিষয় কি না ইন্দ্রিয়ের বিষয়, যথা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। এই সকলের অনুধ্যান করিতে করিতে তৎপ্রতি মনের স্বভাবিক যোগ সংস্থাপিত হয়। "রূপ, রূপ" ভাবিতে ভাবিতে রূপ আর বাহিরে থাকে না, মনের একটী প্রলোভনের বস্তু হয়, এবং মনকে তাহাতে জড়িত করে। চক্ষু যদি সংযত হয়, বাহিরের রূপ—বাহিরেই থাকে, কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের অভাবে মনের ভিতরে রূপ আসিয়া তাহার প্রভাব প্রকাশ করে। একটী উদ্যানের দ্বার বন্ধ না করিলে যেমন বাহিরের গো ছাগ প্রভৃতি জন্তু ভিতরে আসিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করে, বাহ্যবিষয় সেইরূপ অসংযত চিত্তের বিকার সাধন করে। রস গন্ধ প্রভৃতিও বাহিরের বিষয়, কিন্তু তাহারা রূপের ন্যায় মনের আসক্তির কারণ হয়। বাহ্য বিষয় যখন মনের সঙ্গ পাইয়াছে অর্থাৎ মনে বেশ সুখকর বলিয়া লাগিয়াছে, তখন কামনা অর্থাৎ তজ্জন্য প্রবল তৃষ্ণা হয়। তৃষ্ণাতুর মৃগ যেমন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া জলের অন্বেষণ করে, কামনাতুর লোকেরা কামনার বিষয় লাভের জন্য সেইরূপ কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার অনুসরণ করে। এই কামনা ধনের জন্য, মানের জন্য, ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য—শত শত আকারে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতে পারে। কামনা হইতে লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, দ্বেষ উৎপন্ন হয়। কামনা যাহা দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধের সীমা থাকে না। ক্রোধ চণ্ডাল, চণ্ডালস্পর্শে যেমন দেহ অপবিত্র হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, মনের মধ্যে ক্রোধ আসিলে সেইরূপ সম্মোহ হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান থাকে না—হিতাহিত বোধ থাকে না—গুরু লঘু বিবেচনা থাকে না; ক্রোধান্ধ-লোক সম্পূর্ণ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। মোহ হইলে সহজেই

স্মৃতিভ্রংশ হয়। স্মৃতিভ্রংশ দুই প্রকারে হয়—এক, মানুষ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কি করিতে কি করিয়া ফেলে, কিছুই বুঝিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার্য্যদিগের নিকট হইতে যে সকল জ্ঞানোপদেশ পাইয়াছে, তাহাও বিস্মৃত হইয়া যায়। এইরূপে যে লোক স্মৃতিহীন হয়, তাহার আর বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি কিরূপে হইবে? কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এ বুদ্ধি বিবেক তাহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাহার বুদ্ধি লোপ হয়, সে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। জড়েতে ও তাহাতে প্রভেদ থাকে না। মানুষের মন যদি জড় ভাবাপন্ন হইল, তাহা হইলে সে ত মৃত। বিষয়-মগ্ন অচৈতন্য আত্মার জীবন কোথায়?

"তরবোপি হি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি॥"

বৃক্ষেরাও জীবন ধারণ করে, মৃগ পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, ঈশ্বর মনন দ্বারা যে জীবিত, সেই প্রকৃত জীবিত।

বিষয় সেবন দ্বার... পরম্পরা হইয়া অবশেষে ... হইয়া থাকে! বিষ-সেবীদিগের ... সেবী লোক আত্মহত্যা সাধন ক... মহাপাতক-ভাগী হয়। অতএব বিষয়ের প্রথম চিন্তা ও প্রলোভনের প্রতি সাবধান সাবধান সাবধান!!! তাহাই সকল পাপ ও অনিষ্টের উৎস।

"চিন্তয় মম মানস; পূর্ণব্রহ্ম নিরঞ্জনে,
বিষয় মদিরা পানে, থেকো না অচেতনে,
অসার সুখে অবশ।
দেখরে যতনে মাজি হৃদি দরপণে
অরূপ অপরূপ প্রাণরমণে,
সফল করহ মানব-জীবন;
কিবা কাজ আছে আর আসি ভববাসে,
থাকিয়া বন্দিসম মহামোহ পাশে;
কাট ভব-বন্ধন, স্মরি ভব-বন্দন
বিভু-প্রেম সুধারসে, হয়ে সরস।

ভুল।

(৪৪০ সংখ্যা—১৪৭ পৃষ্ঠার পর)।

আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কোনও আড়ম্বর বা গোলমাল নাই। তিনি আসিয়াই সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আমায় সঙ্গে করিয়া কর্ম্মস্থানে লইয়া আসিলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থান বম্বের নিকটে কোন একটি সমুদ্র-কূলবর্ত্তী সবডিভিসানে হইয়াছিল। কি সুখেই আমাদের দিন কাটিত! সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন সুখ-স্রোতে ভাসিতাম। আমাদের ভাগ্যাকাশ যেন নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ছিল।

নূতন সংসার পাতিলে কি আনন্দ!

সেই ক্ষুদ্র গৃহের আমি গৃহিণী হইলাম। সেই অমূল্য হৃদয়রাজ্যের আমি রাণী হইলাম; সকল কর্ত্তৃত্ব, সকল ভার আমার উপর। সেই গৃহের সাজসজ্জা, আহারের ব্যবস্থা, খরচ পত্রের হিসাব করিয়া কত আনন্দ হইত। স্কুলের জীবন অপেক্ষা, শৈশবের জীবন অপেক্ষা ইহা কত মধুর, কত আশায় আলোকিত! তিনি প্রভাতে আমায় সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইতেন, তাহার পর দৈনিক কার্য্য করিয়া আফিসে যাইতেন। সে সময়টা কি প্রকারে কাটিত? সে সময় আমি কোন দিন একটু পড়িতাম, বা সেলাই করিতাম, কখনো চিটিপত্র লিখিতাম। তাহার পর টিফিনের উদ্যোগ করিয়া তাঁহার আশায় বসিয়া থাকিতাম। আফিস কাছেই, তিনি আসিয়া প্রত্যহ টিফিন করিয়া যাইতেন। তাহার পর বৈকালে কোন দিন টেনিস খেলিতাম বা কোন দিন টমটমে করিয়া কতদূরে বেড়াইতে যাইতাম। এই প্রকারে প্রায় বৎসর খানেক কাটিতে চলিল। বড় দিনের ছুটীতে পিসিমা তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা নিরুপমা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া আমায় দেখিতে আসিলেন। অবিনাশ দাদা আমা হইতে দু তিন বৎসরের বড়। তিনি আমায় অত্যধিক স্নেহ করিতেন ও শৈশবে আমার খেলার সঙ্গী ছিলেন। এই সময় একদিন অতি প্রত্যুষে উনি ক্যাম্পে গেলেন। তাহার পর দিনই ফিরিয়া আসিবার কথা। ইতিপূর্ব্বে তিনি যতবার ক্যাম্পে গিয়াছেন, আমিও সঙ্গে গিয়াছি। এবার পিসিমাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া, তাহা ব্যতীত আমার শরীর অল্প অসুস্থ ছিল, সেই জন্য যাওয়া হইল না।

বিবাহের পর এই প্রথম ছাড়াছাড়ি। তাঁহার অদর্শনের আশঙ্কায় আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল, কতবার তাঁহাকে যাইতে দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কতবার মানা করিলাম, তিনি আদরে বার বার চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কালই সকালে আসব, আজ বড় দরকার, তদারকে যাচ্ছি, কাল যত শীঘ্র পারি আসব।"

কেন সে দিন যাইতে দিলাম? কেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম না, আমার কাতর মিনতি কি তিনি অবহেলা করিতে পারিতেন? আজ তাহা হইলে আর জীবনে এই ঘোর ঝটিকা বহিত না।

আমরা সকালে মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময় বেহারা আসিয়া ডাকের চিটি আনিয়া সম্মুখে ধরিল। আহারাদির পর যখন চিটি পত্র দেখিতে বসিলাম, সহসা অবিনাশ দাদা বলিয়া উঠিলেন—"বা! এই যে বিলাতের খাম, এলা, তোমাকে সেখান থেকে কে চিটি লেখে?"

"কই না, আমায় ত কেউ লেখে না, দেখি" এই বলিয়া পত্রখানি তুলিয়া লইলাম। সুস্পষ্ট রমণীর হাতের অক্ষরে লেখা "মিসেস এস রায়।" কৌতূহলী হইয়া তাড়াতাড়ি পত্র খুলিবামাত্র একখণ্ড

কাগজ তলে পড়িয়া গেল। পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার বোধ হইল, এ পৃথিবী ঘুরিতেছে, আমার মাথা কেমন করিয়া উঠিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম, আমি অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক শব্দ করিবা মাত্র, পিসিমা ও অবিনাশ দাদা আমার চেয়ারের নিকট আসিয়া বলিলেন "এরা কি হইয়াছে?"

আমি কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া অবিনাশ দাদার হস্তে দিলাম। পিসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"অবিনাশ, কি লেখা আছে শীঘ্র বল।"

তাহা ইংরাজিতে লেখা ছিল, অবিনাশ দাদা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া পড়িলেন। পত্রটি অবিকল এইরূপ—

"ম্যাডাম,

আপনাকে শিরোনামায় "মিসেস রায়" লিখিতে বাধ্য হইলাম, নতুবা এ পত্র আপনি পাইবেন না। আপনার যিনি স্বামী হইয়াছেন, তিনি ধর্ম্মতঃ আপনার স্বামী নহেন; কারণ তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন আমাদিগের দেশের বিধিমতে আমার বন্ধু মিস লিকে রেজিষ্টারী করিয়া বিবাহ করেন। মিস মেরিয়া লিই প্রকৃত মিসেস রায়। এই বিবাহের সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইলাম, আসল এখানে আছে। মিঃ রায় এ বিবাহ অস্বীকার করিতে পারেন, কারণ বাঙ্গালী চিরকালই ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক। নতুবা তিনি মিস লি কে বিবাহ করিয়া, পুনরায় কোন্ সাহসে অন্য নারীকে বিবাহ করিলেন? আমরা পূর্ব্বে সংবাদ পাই নাই, নতুবা গিয়া বারণ করিতাম। এখন আমার বন্ধু একটি শিশু সন্তানের জননী, তিনি কি প্রকারে আপনার অধিকার ত্যাগ করিয়া শিশুকে পিতৃনামে বঞ্চিত করিবেন? যাহা হউক আমরা আপনার দুঃখে একান্ত দুঃখিত। শীঘ্রই আমরা আপানাদের স্বত্ব বুঝিয়া লইব। ঈশ্বর আপনাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন।

কেম্ব্রিজ তাং—সন আপনার বিশ্বাসী

এম এল স্মিথ।"

তাহার পর পিসিমা আমার হাত হইতে যে কাগজ খণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা উঠাইয়া সম্মুখে ধরিলেন। দেখিবা মাত্র বুঝিলাম তাহা বিবাহের সার্টিফিকেট। আমার মাথা কেমন করিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আমার ইতি-পূর্ব্বেও দু একবার হিষ্টিরিক ফিট হইয়াছিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন আমার মনে হইল কে যেন আমার হৃদয়ে একখণ্ড ভারী প্রস্তর বসাইয়া দিয়াছে। আমি শয্যা হইতে মস্তক তুলিতে পারিলাম না। কেবল যেন মৃত্যুই আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। আমার স্বামী আমার নহে, আমার স্বামী বলিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই, যদি কখনও কোন রমণীর হৃদয়ে এই দারুণ ভাবনা হইয়া থাকে, তিনিই তা হ'লে আমার এই অব্যক্ত যাতনা বুঝিবেন। আমি আকুল হইয়া ভাবিতেছিলাম, কি যে করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম

না। আমি বিশ্বাসের সপ্তস্বর্গে বাস করিতেছিলাম, সহসা এ কিসের ঝটিকায় আমায় অবিশ্বাসের অন্ধকারময় পাতাল পুরীতে নিক্ষেপ করিল? আমার হৃদয়ের সুরক্ষিত কুসুমিত উদ্যান সহসা এ কি প্রকারে মরুভূমিতে পরিণত হইল? সহসা আমার জীবন বসন্তে কে এ ঘোরতর বর্ষা আনিয়া দিল? আমার মনোবীণা মধুর রাগিণীতে বাজিতেছিল, কে সে বীণাকে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া বেসুর করিয়া দিল? সেই একখানি পত্র, তাহাতেই আমার জীবন-গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পিসিমা দুই একবার কাছে আসিয়াছিলেন, কোথায় তিনি আশার মোহিনী বাণী শুনাইয়া প্রাণে সান্ত্বনার ধারা ঢালিবেন, না তিনি আসিয়া আরও অবিশ্বাস সন্দেহের তীব্র বিষ-রাশি হৃদয়েঢালিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন—

"কে জানে এ কি রকম কথা গো। তাড়াতাড়ি বিয়ে হল, বিলেতের কোন সংবাদ ত জানা হল না। যেমন এলো, অমনি তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিয়ে এই দূরে চলে এলো। কে জানে সত্যি কি মিথ্যা। আর বিলাতে ত এমন ধারা কত হচ্ছে, সুন্দরী মেমদের রূপে মুগ্ধ হয়ে একটা পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে বসে, পরে অনুতাপে পুড়তে হয়। তাই যাই হোক, সুকুমার এ বিষয়ে বেশ পরিষ্কার করে না বুঝিয়ে দিলে আর তোমার তার সঙ্গে একত্রে থাকা হবে না। এ বিয়ে হয়ে আমাদের পবিত্রকুলে কালি পড়ল দেখছি।"

আমি নীরবে শুনিয়া নীরব রহিলাম। সে কথার কি উত্তর দিব? যখন আমারই বিশ্বাস টলিয়াছিল, তখন অন্যের কেন না টলিবে। আমি সারাদিন শয্যায় পড়িয়া রহিলাম, আমার হৃদ্‌পিণ্ড কে যেন দলিতে লাগিল। কত ভাবিলাম, কত কাঁদিলাম, ভাবনার আর রোদনের কি সীমা আছে? সন্ধ্যা হইলে গৃহে আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইতে উঠিলাম। উঠিয়া সম্মুখে বিচিত্র প্রস্তরমণ্ডিত দর্পণের পার্শ্বে স্বামীর চিত্র দেখিলাম। আত্মহারা হইয়া সেই ফটোগ্রাফ উঠাইয়া, হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম। চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া গেলাম। আবার চক্ষের জল মুছিয়া গৃহের চারিদিকে চাহিলাম, তিনি আমার মনোরঞ্জনের জন্য কত সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত দ্রব্যে সে গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রতি জড় দ্রব্য তাঁহার হৃদয়ের অমূল্য প্রেম ব্যক্ত করিতেছে। যিনি আমার সুখের জন্য সকল কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, আমার মুখের হাসি দেখিতে কত আত্মত্যাগ করেন, তিনি কি এরূপ প্রতারক হইবেন? কখনও না, বোধ হয় কেহ শত্রুতা করিয়া এই বাদ সাধিয়াছে। আমি কাহার কি করিয়াছি যে আমার কেহ শত্রু থাকিবে? ঈশ্বরের চক্ষে কি আমাদের সে অবিচ্ছিন্ন সুখ সহিল না? কোন্ পাপে এত মনস্তাপ পাইতেছি?

শৈশবেই অমূল্য মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা হইয়াছি। প্রবাসে স্নেহময় পিতার সহসা মৃত্যু হইল, একবার সেই প্রীতিপূর্ণ মুখ চক্ষে দেখিলাম না, একবার শেষ দুটি স্নেহবাণী শুনিলাম না। তাহার পর আমার সেই শোকতপ্ত প্রাণে কে এ প্রেমের অমৃত ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। যাঁহাকে দেখিয়া, যাঁহাকে ভালবাসিয়া আমার জীবন ধন্য হইয়াছিল, আমি ধন্যা হইয়াছিলাম, কেন আমার জীবনের একমাত্র সুখ—আমার সর্ব্বস্ব রত্নকে, বিধাতা এরূপ নির্দ্দয় ভাবে কাড়িয়া লইতেছেন? আবার চিন্তা সূত্র ছিন্ন হইয়া অন্য স্রোতোভিমুখে গেল, ধীরে ধীরে ধীরে সেই পার্শ্বস্থিত সার্টিফিকেট খানা তুলিয়া লইলাম। একি কখনও জাল হইতে পারে? পুনরায় পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম। পত্রের অন্য পৃষ্ঠায় বিলাতের লণ্ডনের একটি গির্জ্জার নাম ও দুইজন লোকের স্বাক্ষর আছে, একটি আচার্য্যের ও অপরটি উপাচার্য্যের। একি সব মিথ্যা? অসম্ভব, ইহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা হইলে সেই সুন্দর ইংলণ্ডে আমারি মত অন্য একজন রমণী-হৃদয় বেদনায় অধীর হইতেছে। এমনি ভাবে ব্যাকুল হইতেছে! স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস কি ভীষণ যন্ত্রণা, তাহা যে রমণী একবার বুঝিয়াছেন, তিনিই জানিবেন যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর অধিকার নাই, আর আমার স্বামী এ কথা পর্য্যন্ত বলিবার অধিকার নাই, ইহার চিন্তা পর্য্যন্ত কি ভীষণ যন্ত্রণাময়। আমি কে? আরত আমি তাঁহার পত্নী নহি, ধর্ম্মতঃ তিনি সেই ইংরাজ মহিলারই স্বামী। এ কথা কি ভাবিতে পারা যায়? আমি হৃদয়-বেদনায় অধীর হইয়া সেই মহার্ঘ ম্যাটিং মণ্ডিত কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িলাম। এই আমার শয়ন-কক্ষ, কক্ষের মূল্যবান্ পালঙ্ক, ওই সুন্দর ড্রেসিং আলমায়রা, এই বিচিত্র শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত দর্পণ, আমার ড্রেসিং কেস সকলি আমার কত যত্নের। এই সুন্দর মেহাগানি কাষ্ঠের আরম চোয়ার, রাত্রে আহারাদির পর তিনি উহাতে প্রত্যহ শয়ন করিয়া থাকিতেন। কোন দিন বা পুস্তক পড়িতেন, কোন দিন আমি পড়িয়া শুনাইতাম। অমনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জগতে দুর্লভ সেই পবিত্র ভাবপূর্ণ মুখ আমার মনে পড়িয়া গেল। সে মুখ দেখিয়া কেননা ইংরাজ-রমণী আপনা হারাইয়া ভাল বাসিবে? আমার এই তৃষিত চোখেত তাঁহার সকলি সুন্দর, কিন্তু কে তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া না জানে? তাঁহার উন্নত প্রশস্ত ললাটের মহিমা কি সুন্দর! সেই কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছ কি সুন্দর! সেই বিশাল প্রেমোজ্জ্বল হাস্যপূর্ণ নয়নের দৃষ্টি কি সুন্দর! সেই মধুর হাসি কি সুন্দর! সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরত্ন সেই মহামূল্য হৃদয়, তাহা কি উদার, কি মহানুভব! দয়া করুণা ও নম্রতায় পূর্ণ, স্নেহে প্রেমে বিগলিত, পরদুঃখে ব্যথিত, তাঁহাকে

কে না ভাল বাসিবে? আমি অভাগিনী তাই বুঝি আর সে হৃদয়ে আমার অধিকার নাই। আমি কি করিব? আমার রোদন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সারা রাত প্রায় সেই ভাবে কাটিল। প্রত্যুষে আমি আর শয্যাত্যাগ করি নাই। প্রভাতে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা, তবে সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। পিসিমা আসিয়া চা পান করিতে যাইবার জন্য ডাকিলেন, আমি শরীরের অসুস্থতার জন্য যাইতে পারিব না বলায় চলিয়া গেলেন। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইবার মুহূর্ত্ত পরেই আমাদের টমটমের ও অশ্বের পদশব্দ পাইলাম। তিনি আসিতেছেন, এত শীঘ্র আসিতেছেন, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। তবে কি আবার আমি যেমনি ছিলাম, তেমনি সুখী হইব? ভাবিবার অবসর পাইলাম না। গাড়ী থামিল, মুহূর্ত্তেই তিনি দ্রুত পদক্ষেপে ডাইনিং রূমে প্রবেশ করিয়া বোধ হয় পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কই এলা কই? অসুখ করেছে নাকি?" সেই ভয়-চকিত স্বরে কেবল গভীর প্রেম-আকুলতা ব্যক্ত হইতেছিল। পিসিমার উত্তর শুনিলাম না, তাহার পর তিনি প্রায় ছুটিয়াই শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন সকল গবাক্ষ রুদ্ধ এবং পর্দ্দার আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। গৃহে অতি মৃদু আলোক প্রবেশ করিতেছিল। তিনি প্রবেশ করিয়াই কম্পিত হস্তে শয্যার মশারি তুলিয়া আমায় হৃদয়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন "এলা! কি হইয়াছে এলা! কেন কাঁদ? দেখ আমি কত শীঘ্র এসেছি। রাত ৩টায় বাহির হইয়াছি, তাই এত সকালে আসিতে পারিলাম।" সেই সম্বোধনে সেই আদরে আমার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, নয়নের রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া উঠিল, আমি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কতবার আদর করিয়া কত আশ্বাসহকারে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, চক্ষের জল মুছিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে সেই পত্র ও সার্টিফিকেট খানি তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলাম। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া, গবাক্ষের নিকট গিয়া পর্দ্দা সরাইয়া গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমিও হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া আলমারি পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। সারাদিন ও রাত্রের মানসিক যন্ত্রণায়, অনিদ্রায়, অনশনে আমার দেহ কম্পিত হইতেছিল। দেখিলাম পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার চক্ষে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে ললাটের ধমনী বিকম্পিত হইতে লাগিল। ঘৃণা ও ক্রোধ বিমিশ্রিত দৃষ্টিতে সে পত্র শেষ করিয়া আমার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। ফিরিয়াই সে মুখের কি পরিবর্ত্তন হইল, ব্যথিত নয়নে শুধু আকুল প্রেম ব্যক্ত হইল। সেই স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে কহিলেন "এলা, এই কি তোমার কষ্টের কারণ? তুমি কি ইহা বিশ্বাস করিয়াছ?"

আমি কিছু না বলিয়া, অজানিত ভাবে মস্তক হেলাইয়া বলিলাম "হাঁ।" "কি বলিলে? আবার বল শুনি।" এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি নিতান্ত কঠিন ভাবে চাহিলেন। সেরূপ কঠোর ভাবে তিনি আমার সহিত সেই প্রথম কথা কহিলেন।

আমিও অস্বাভাবিক কঠিন স্বরে বলিলাম "ইহাতে কি প্রকারে অবিশ্বাস করিব? বিবাহের সার্টিফিকেট রাহিয়াছে, ইহা কি জাল?" তিনি হাসিয়া উঠিলেন। অন্ধকার মেঘপূর্ণ আকাশে বিদ্যুতের আলো যেমন চমকিয়া উঠে, তাঁহার মুখের সে হাসি সেইরূপ। তিনি তাহার পর অবিচলিত কণ্ঠে, আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া বলিলেন :—

"এলা, আমার কথা কি তোমার সত্য মনে হবে না? আমি তোমায় বলিতেছি যে আমি কখনও এরূপ জঘন্য নীচভাবে একজনকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার তোমাকে বিবাহ করি নাই। বিবাহ দূরের কথা, ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিয়া বলিতেছি তোমা ভিন্ন আমি এ পর্য্যন্ত অন্য কাহাকেও ভালবাসি নাই।" এই কথার মূল্য পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল। এখন কি তাহা সত্য? মনে হইল। আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম "পিসিমা বলিতেছিলেন এরূপ বিবাহ করা আশ্চর্য্য নহে। বিলাত প্রলোভনের স্থান, সেখানে লোক সকলি করিতে পারে।" "তোমার পিসিমা বলিয়াছেন? আশ্চর্য্য লোক যে এইরূপ পরামর্শ দিতে পারেন, আমি তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যাই হোক এলা, তুমি লোকের মিথ্যা কথায় আমার উপর বিশ্বাস হারাইও না। কেন মিথ্যা অভিমান করিতেছ?" এই বলিয়া তিনি পুনরায় আমাকে বাহুতে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমায় সরিয়া যাইতে দেখিয়া পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব ভাব হইল। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—

"কি তুমি সরিয়া দাঁড়াইলে? আমায় ছুঁইতে তোমার ঘৃণা হইল? এই তোমার ভালবাসা? কি আশ্চর্য্য, আমি এত দিন কি ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। যে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি বিশ্বাস নাই, তাহার সহিত বন্ধন থাকা না থাকা সমান। এলা, এখনও বুঝিয়া দেখ, তুমি স্ব-ইচ্ছায় আমাদের সুখের সংসারে এই দুঃখ রাশি ডাকিয়া আনিতেছ।"

আমার মনের ভাব সে সময় যাহা হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার নহে। ভাবিলাম 'একি! প্রতারণা করিয়াও এত গর্ব্ব? আমি প্রাণ মন সঁপিয়া ভালবাসি জানিয়াইত আমায় এত তুচ্ছ করিতেছেন; না আমি কোনরূপ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করিব না।' আমি স্থির কণ্ঠে বলিলাম "বিশ্বাসের কথা হইতেছে না। এ পত্র কে লিখিল, কেন লিখিল, ইহা সত্য কি মিথ্যা—আমি

প্রমাণ না পাইলে কোন কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না। সম্মুখেইত প্রমাণ রহিয়াছে—এই বিবাহের সার্টিফিকেট, চার্চ্চের নাম, পুরোহিতের নাম পর্য্যন্ত রহিয়াছে, এসব কি মিথ্যা হইতে পারে? আর আমার নামই বা সে কি প্রকারে জানিল?"

"আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আমি এ বিবাহ করি নাই; এলা, আমায় কষ্ট দিয়া কি সুখী হইবে?" তাঁহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া করুণ ব্যথিত কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয় মথিত হইতেছিল। এমন সময় সহসা গৃহের দ্বার খুলিয়া পিসিমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হয়ত তাঁহার সেই কথার পর আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম। হয়ত আমাদের বর্ত্তমান দুঃখের কালো মেঘরাশি কাটিয়া যাইত। কিন্তু পিসিমাকে দেখিয়াই আমার লজ্জায় ঘৃণায় হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পিসিমা কঠিন স্বরে কহিলেন "তোমাদের কি স্থির হইল? সুকুমার! তোমার কি এই কাজ করা উচিত হইয়াছে?"

"কি কাজ পিসিমা? আপনি কোথায় এলাকে বুঝাইবেন, না আপনি আরও তাহাকে এই সব অন্যায় মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করাচ্চেন?"

'অন্যায় কি করিয়া বলি? আজ কাল বাঙ্গালীর বিলাতে গিয়া মেম বিবাহ করা কি অসম্ভব? তোমার মত এমন কি কেহ করে নাই? ভাবিয়া দেখ যদি সত্য হয় ত এলার দশা কি হইবে? আজ তাহার পিতা থাকিলে কি হইত বল দেখি?" তিনি পিসিমার প্রতি ঘৃণা রোষ-বিমিশ্রিত কটাক্ষে চাহিয়া দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। পিসিমা আমায় বলিলেন —"তোমায় কলিকাতায় আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, তোমার বাবা নাই বলিয়া কি বংশের মান নাই? যত দিন না সুকুমার এ বিষয়ের পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দেন, ততদিন পৃথক্ থাকিতেই হইবে।" আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল, আমি অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিলাম "এ কথা কাহাকেও বলিও না পিসিমা, আমি তা হলে সেই দিনই এ প্রাণ রাখিব না। উনি যাই করুন, ধর্ম্মত আমারই স্বামী। লোকে যেন এ কথা না জানে।"

(৩)

তিনি আফিসে গিয়া দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া আসিলেন। আমাদের কলিকাতা যাইবার সকল বন্দোবস্ত হইতে লগিল। জিনিস পত্র প্যাক করিবার সময় হইল না। কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্য লইয়া আমরা কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করিলাম, বাকি অবিনাশ দাদা পরে পাঠাইবেন স্থির হইল। যে দিন কলিকাতা যাত্রা করিব, তাহার পূর্ব্বদিন আমি একাকী পদব্রজে সমুদ্র তীরে বেড়াইতে গেলাম। কিয়ৎক্ষণ অলস ভাবে ভ্রমণ করিয়া আমি শ্রান্ত হইয়া

সৈকতে বসিয়া রহিলাম। সেই অসীম নীল জলের প্রতি অনন্তমনে চাহিয়া রহিলাম। তখন প্রায় সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, সেই নীল জলের সহিত নীলাকাশ মিশিয়া যাইতেছিল, মধ্যে সেই লোহিত সূর্য্যের কিরণ মুমূর্ষুর হাসির মত জলিতেছিল। সূর্য্য যেন একটি রত্নাঙ্গুরীর উজ্জল প্রস্তরের ন্যায় সিন্ধু ও আকাশের নীলিমার মধ্যস্থলে জলিতেছিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার শীতল অলস বায়ু বহিতেছিল। আমি কতক্ষণ সেইভাবে নীরবে বসিয়া ছিলাম তাহা মনে নাই, এমন সময় সহসা সম্মুখে একটি ছায়া পড়িল, ফিরিয়া দেখিলাম তিনি। সেই সুন্দর মুখ কে যেন বিষাদের কালিমায় আবৃত করিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া আমার পার্শ্বে সেই বালুকা সৈকতে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি স্থির অবিচলিত কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন—"এলা! এখনও আমায় একবার বল যে তোমার আমার প্রতি অবিশ্বাস নাই, তাহা হইলে আমি কলিকাতা যাওয়া বন্ধ করিয়া দি। কেন অপনি কষ্ট পাইতেছ! বিনা কারণে কেন আমায় এ কষ্ট দিতেছ?

"এ বিষয়ের মীমাংসা না হইলে আমি কখনও তোমার ধর্ম্মপত্নী নই। তোমার পত্নী না হইলে কি প্রকারে তোমার সহিত একত্র বাস করিব? তুমি বুঝিতেছ না তাই এই প্রকার বলিতেছ। আমার যন্ত্রণা বুঝাইবার নহে"—আর বলিতে পারিলাম না, যেন কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

"কিন্তু আমার কথাই কি তোমার ধর্ম্ম নহে? তাহাই কি তোমার বিশ্বাস করা উচিত নহে? আমাদের এই প্রথা অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু প্রথা অনেক ভাল ছিল, তখনকার স্ত্রীরা এমন কথায় কথায় স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইত না। কিন্তু এলা! আমি আর একবার—এবং শেষবার তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি এখনও যদি আমায় বিশ্বাস না কর, আমার কথা বুঝিতে না পার, তাহা হইলে চির-জন্মের মত তোমায় আমায় সম্বন্ধ শেষ হইল জানিও। এই আমাদের শেষ দেখা। এখনও যদি তুমি আমার সেই পূর্ব্বের চির আদরের এলা হইতে পার, আমায় ভাল বাস, বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি এ সকল কথাই ভুলিয়া যাইব এবং তোমার ইচ্ছামত এই পত্রের ও সার্টিফিকেটের তদন্ত করিয়া, যথার্থ সব কথা জানিতে চেষ্টা করিব। এলা, এখনও বল তুমি আমায় বিশ্বাস করিবে কি না?"

"যত দিন না এ বিষয়ের তদন্ত হয়, আমায় পিসিমার বাটিতে রাখিয়া দাও। তার পর সব পরিষ্কার হইয়া গেলে, আমায় আনিও, আমি আসিব। যতদিন না আমি যথার্থ প্রমাণ পাইব, তত দিন আমাদের একত্র বাস অসম্ভব। এ কালের হিন্দু বিবাহের সহিত কি আমাদের বিবাহের তুলনা হয়? যদি যথার্থই তুমি ধর্ম্মমতে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া থাকত, আমি কি হইয়াছি তাই বল?

"এলা! এই ঈশ্বর সম্মুখে শপথ করিয়া বলিতেছি, আজি হইতে আমি তোমার কথাই পালন করিব, তোমার ইচ্ছায় তোমার সুখের জন্য, আমার জীবনের সব সুখ বিসর্জ্জন করিলাম। কিন্তু এলা! তুমি জানিও আমি নির্দ্দোষী, তুমি যখন বুঝিবে তোমার এই মিথ্যা অবিশ্বাসের কঠিন কথায় আমায় কি ব্যথা দিয়াছ, তখন অনুতাপে তোমার হৃদয় দগ্ধ হইবে। আমি আর কখনও তোমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিব না। তবে যে দিন তুমি আমার পায়ে ধরিয়া সাধিবে, মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিবে, আমি তোমায় ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিব না। আমি আজই এক বৎসরের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিব। ছুটী মঞ্জুর হইলেই বিলাত চলিয়া যাইব।"

"এই যে তোমরা এখানে, আর আমি সারাদেশ খুঁজিয়া বেড়াইলাম।" ফিরিয়া দেখি অবিনাশ দাদা। এই প্রকারে আমার দ্বিতীয় সুযোগও শেষ হইল। অবিনাশ দাদা আমার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর নানা কথা উত্থাপন করিয়া, অবশেষে বলিলেন— "সুরো, কেন তুমি ইহাদের কথা শুনিয়া মিথ্যা ছুটী লইতেছ? এখান থেকে তদন্ত করিলে কি হইত না? আর এক কথা সে বিলাতের খামে ঠিকানা দেখি[illegible] ছিলে কি? কোন [illegible] হইতে পোষ্ট করা [illegible]ইল? তোমার কি কেহ শত্রু আছে যে এ প্রকার শত্রুতা করিতে পারে?" "ঠিক্ বলিয়াছ, আমি সে খামখানা দেখিতে চাই।" এই বলিয়া তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার পশ্চাতে গৃহে আসিলাম, আসিয়া শুনিলাম সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইয়াছে, তবু সে খাম পাওয়া যায় নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিলাম। পিসিমা তাঁহার নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন। আমার স্বামী তাঁহার ভগিনী-পতিকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তিনি ষ্টেসনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিষ্টার বসু কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, ইংরাজ পাড়ায় একটি সুন্দর সুপরিষ্কৃত বাটীতে বাস করেন। আমাদের গাড়ী থামিবা মাত্র হাস্যমুখে ননদ আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি আমার স্বামীর অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা। তাঁহার নিকট আসিয়া আমি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। তিনি আমাদের উভয়ের দ্রব্য সকল একটি শয়ন ঘরে রাখিতে চাকরদিগকে আজ্ঞা দিলেন। বোধ হয় সেই সময় আমার স্বামী আমার মুখের ভাব দেখি[illegible] হৃদয়ের কথা বুঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহা[illegible] ভগিনীপতিকে বলিলেন—"আমার আজ বিশেষ দরকার আছে, সুরেশ (কোন বন্ধু) পূর্ব্বেই আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আজ রাত্রে তার ওখানে মস্ত ধুমধামের

পার্টি আছে। আবার বোধ হয় থিয়েটারেও যাবে। আমার যদি খুব রাত হয়ত আসার সম্ভাবনা নাই।” তাহার পর আমার প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধ বিদ্যুতের মত হাসিয়া বলিলেন—“এলা, আজ সুষমা ও চারুকে তোমার ঘরে শুইতে বলিও, কেমন, তাহলে ভয় কর্ব্বে না ত?” আবার ভগিনীপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“আমি তোমাদের ছোট হাজরির পূর্ব্বে আসিয়া হাজির হইব,” এই কথা বলিয়া আপনার হ্যাণ্ড-ব্যাগ বাহির করিয়া ভগিনীপতির সহিত চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় আমি একাকী শয়ন কক্ষের গবাক্ষের নিকট বসিয়াছিলাম। সম্মুখে পরিষ্কৃত ছাঁটা আসনের মত শ্যামল টেনিস গ্রাউণ্ড। অন্য দিকে গোলাকার শ্যাম পুষ্পরাশির প্লট, তাহার চারিদিকে নানা জাতীয় পুষ্পরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। পথের অপর পার্শ্বে একজন ইংরাজের বাটী। সম্মুখেই কয়েকটি প্রস্ফুটিত কুসুম-সদৃশ বালক বালিকা ক্রীড়া করিতেছ, একজন পুরুষ ও রমণী উভয়ে উভয়ের কর ধারণ পূর্ব্বক পাদ-চারণা করিতেছেন, কখনও মৃদু হাস্য করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বালক বালিকার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সেই ইংরাজ রমণীকে দেখিয়া পুনরায় আমার সকল কথা মনে পড়িয়া গেল। মিস মেরিয়া লি, বোধ হয় তিনি অত্যন্ত সুন্দরী হইবেন, নহিলে উনি কেন তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আসিবেন। তবে কেন আমায় বিবাহ করিলেন? চিরদুঃখিনী করিবেন বলিয়া? এই খানে বলিয়া রাখি, আমার পিতার অতুল সম্পত্তি ছিল, আমিই তাহার অধিকারিণী এবং আমার পিতাই আমার স্বামীকে বিলাতে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সহসা মনে পড়িয়া গেল, পিসিমা অবিনাশ দাদাকে গোপনে বলিতেছিলেন “বোধ হয় সেখানে কোন দরিদ্রের মেয়েকে বিবাহ করিয়া থাকিবে, এখানে আসিয়া এলার ওই সৌন্দর্য্যে ও সম্পদে পুনরায় ভুলিয়া গিয়াছে।” এলার সৌন্দর্য্য? আপনা আপনিই সম্মুখস্থ দর্পণে দৃষ্টি পড়িল। যে স্ত্রী স্বামীর চক্ষেই সুন্দরী নহে, তাহার সে বিফল সৌন্দর্য্যে কি ফল হইবে? আমি নিজেকে সুন্দরী বলিতে পারি না ও সে গর্ব্ব কখনও মনেও আনি নাই, তবে যে অসীম প্রণয় অতুলনীয় আদরে আমার গর্ব্বের ও সুখের সীমা ছিল না, সেই কথা—সেই আদর সহসা মনে পড়িয়া গেল। তিনি যখন তখন আমায় বলিতেন “এলা, আমি তোমার মত সুন্দরী কোথাও দেখি নাই।” আমি অমনি বলিতাম “কেন বিলাতেও না?”

“না, সেখানেও না, ইংরাজের মেয়েরা তোমাদের চক্ষে সুন্দরী হইতে পারে, কিন্তু আমার চক্ষে এত সুন্দর কেহ নাই।” হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম। বুঝি আমার

সে জীবন্ত জাগ্রত সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

এমন সময় ধীরে ধীরে সেই কক্ষের দুয়ার খুলিয়া ননদ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া সস্নেহে আমার দুইটি হাত ধরিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পরে অতি মৃদু যাতনা-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"এলা, আমি সব শুনিয়াছি। সুকো তাহার ভগিনীপতিকে সে চিঠি দেখাইয়াছে। তিনিত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ছিঃ তুমি এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করিলে?"

"এ কথা কয় দিন গোপন থাকিবে দিদি? এ কথা যত দিন না পরিষ্কার হয়, ততদিন আর আমার কি সুখ শান্তি আছে? আর যে আমার তাহা কখনও হইবে সে বিশ্বাস হয় না!"

"কেন বৃথা সন্দেহে কষ্ট পাইতেছ, নির্দ্দোষীকে কষ্ট দিতেছ? সুকো বলিতে-ছিল এখনও তুমি ক্ষমা চাহিলে সে বিলাত যাইবে না। সেই বিদেশে কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া, ভবিষ্য আশা দলিত করিয়া, এই দারুণ দুঃখ ভার হৃদয়ে বহিয়া, সেই দূর প্রবাসে একাকী যাইতেছে, তাহার জন্য কি তোমার কষ্ট হইতেছে না?"

আমি আর অশ্রুজল সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদিত করিলাম! সারা দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। দিদি সযত্নে আমার হাত সরাইয়া কোলে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলাম, এবং জড়িত অশ্রু-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"তিনি চলিয়া যাইবেন শুধু তাঁর দুঃখ? আর আমি যে দুঃখিনী আমার একমাত্র সর্ব্বস্ব রত্ন হারাইতে বসিয়াছি, আমার চেয়ে কে দুঃখী? যাঁহাকে পাইয়া, যাঁহাকে ভালবাসিয়া, যাঁহার ভালবাসায় আমি ধন্য হইয়াছিলাম, এ সংসার আমার স্বর্গতুল্য হইয়াছিল, আজ আমি সেই সুখ স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া এ কি যাতনার আগুনে পুড়িতেছি! ইহা আমার জীবনের ঘোর পরীক্ষা। যদি কেহ জানিতে পারে তিনি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া পুনরায় আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা হইলে কি হইবে? আমিত তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে বলি নাই। এ স্থান হইতে কি তদন্ত হইত না? আমার আর বাঁচিতেও সাধ নাই, শীঘ্র মৃত্যু আসিয়া এ সকল যন্ত্রণার অবসান করুক এই প্রার্থনা।

"ছিঃ এলা, এখনও তোমার বিশ্বাস হয় সুকো বিবাহ করিয়াছিল? সে কখনও এরূপ প্রতারণা শেখে নাই। এ কোনও শত্রুর কাজ। তুমি বোধ হয় এখনও তাহাকে ভালরূপ চেন না, তাই এই সামান্য উপহাস-যোগ্য কথাকে এতখানি করিতেছ। আমি যা বলি শুন, স্ত্রীলোকের স্বামীর নিকট আবার মান অপমান কি? যা হইবার তা হইয়াছে, সুকো কাল আসিলে তুমি ক্ষমা চাহিও লক্ষ্মীটি, তাহা হইলে সে বিলাত যাইবে না। যদি সে বিলাত যায়, সেখানে গিয়া তার কোন

সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়া কিছু বিপদ হয়, তখন কি হবে ?" আমি কোনও উত্তর দিলাম না। শয্যায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সহসা এই কথায় হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া জ্ঞান-শূন্য হইলাম।

(ক্রমশঃ)।

পুষ্প।

মঙ্গলময় বিধাতা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তলে মানব জাতির সুখ, সৌন্দর্য্য ও বিলাসের জন্য কত না শোভাময় বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন! কিন্তু এমন কোন অনায়াস-লভ্য দ্রব্য আছে যাহা ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, বালক ও নারী সকলেই অকাতরে সমভাবে ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে? সেটি ভগবানের পরম স্নেহের দান—পুষ্প। মণি রত্ন কাঞ্চন বহুবিধ দুর্ম্মূল্য বস্তুর সৌন্দর্য্য পুষ্পের নিকট হার মানিয়া লয়, অথচ ইহা বিশ্বপতি এমন সুপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে মানব জীবন কখনও ইহার অভাবে লালায়িত থাকে না। ইহাতে বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যময়ী রাজাধিরাজ তনয়ারও যেমন অধিকার, বৃক্ষচ্ছায়া-নিবাসিনী দরিদ্র বালিকারও তদনুরূপ! এমন সুন্দর ও শোভাময় ও গুণবিশিষ্ট আভরণ আর কি আছে? মণিময় আভরণ কেবল চাকচিক্যে উজ্জ্বল করিয়া ভুলাইয়া রাখে, কিন্তু সামান্য কুসুম-মালিকার সৌরভে প্রাণের অন্তর বাহির মুগ্ধ হয়। ধন্য রচয়িতার সুকৌশল! পুষ্পহার দেবদত্ত আভরণ, তাই বুঝি সর্ব্বকালে সমভাবে সকল জাতির মধ্যে কুসুম দামের এত আদর—এত গৌরব। মানুষ জন্মিয়া অবধি মরণ পর্য্যন্ত ফুলের ব্যবহার করে। সকল জাতির সকল উৎসবেই পুষ্পমাল্য পুষ্পগুচ্ছ পুষ্পদল লইয়া নাড়া চাড়া। কিন্তু হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন। ফুল দেখিলেই ইংরাজ মহিলা সৌরভে আকুল হইয়া মুখে বুকে ধারণ করেন। কিন্তু হিন্দু রমণীরা সুন্দর পুষ্পদল দেবতার পদে দিলেই সুখী, পরে নিজে প্রসাদ উপভোগ করেন। হিন্দু মুসলমান ইংরাজ সকল জাতির মধ্যে যে দিন নরনারী সংসার কাননে প্রথম পদবিক্ষেপ করেন, সে দিন বিভিন্ন প্রকৃতির দুটি প্রাণকে কে এক করে? সৌরভময় কুসুম সকল অলঙ্কারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া বর বধূকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া প্রীতি-সাগরে ডুবাইয়া দেয়। ফুলের আসর, বাসর, শয্যা, সকলি ফুলময়ী সৌরভিনীরূপে বিবাহ উৎসব পূর্ণ করে। পরে আবার সেই বিষম বিদায়ের অন্তদিনেও এই পুষ্পমালাতেই শেষ সজ্জা! ইহাতেই শেষ হয় না। সমাধির উপরে ফুলগুচ্ছ, চিতায় ফুল চন্দন, জাহ্নবীর স্রোতেও

নির্ম্মাল্য দলে মিশিয়া মিশিয়া কত দেহ ভাসিয়া যায়! তাই মনে হয় জগদীশ্বর এই সুন্দর সুগন্ধশালী পুষ্প মানব জীবনের আদি অন্তের জন্য রচিয়াছেন।

রমণীর বিকশিত কাননে ফুল্ল কুসুম দলের সহিত তুলনা করিয়া ইহারই অবিকল বিধাতার আর একটি সুন্দর দান প্রতি বক্ষে বক্ষে দেখিতে পাই, সেটি মধুময় হাসিভরা কোমল শিশুমুখ। পাঠিকাগণ! কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই পুষ্পর সহিত ইহার অবিকল সাদৃশ্য কি না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব ভগবান্ যখন এমন অতুলনীয় উৎকৃষ্ট ধনের অধিকারিণী করিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা আমরা যেন প্রকৃত সুখের অধিকারিণী হইতে পারি। সুগন্ধ ফুলের মালাগাছি যদি ধুলায় পড়িয়া মলিন হয়, কিম্বা অযত্নে দলগুলি ছিঁড়িয়া যায়, কিম্বা কুকুর বিরালের গলায় ঝুলাইয়া দি, তাহা হইলে কি শোভা পায়? সেইরূপ যদি আমরা নিজ নিজ শিশু সন্তানগণের শরীর মনের রক্ষণ ও পোষণ না করি, তাহা হইলে কি অযত্ন-সম্ভূত কণ্টকাবৃত কুসুমরাশির মত উহার অপব্যবহার করা হয় না? পরম দয়াবান্ দেবতা যেমন আমাদিগকে দয়া করিয়া জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া নানা সুখের পথ দেখাইয়াছেন, আমাদেরও কর্ত্তব্য এই সংসার কাননে প্রস্ফুটিত পুত্র কন্যাগুলিকে সমভাবে সদ্বুদ্ধি বিদ্যা দ্বারা সুশোভিত করিয়া গোলাপমালার মত গলায় পরিয়া ধন্য হই। তাহাদের চিত্তোত্থিত সুন্দর গুণরাজি ধূপ গুগ্‌গুলের ন্যায় সুরভি উড়াইয়া জগতের ঊর্দ্ধ অধঃ চারিদিকে বিস্তার করুক। শান্তিময়ী তনয়াগুলি পরিবারের ও গুণবান্ তনয়গণ সমাজ ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক। পুষ্প-স্তবক যেমন ভগবদারাধনার প্রধান উপকরণ, সেইরূপ এই সংসার সুখের শ্রেষ্ঠ উপাদান পুত্রকন্যাগুলির হৃদয় মূলে যেন ভক্তি রস সিঞ্চন পূর্ব্বক তাহাদের চিত্তবৃত্তি পবিত্ররূপে বিকশিত করিতে পারা যায়। তাহারা যেন সময়ে হসিত পুষ্পের মত ফুটিয়া উঠিতে সক্ষম হয়। কাঁটা খোঁচার মত কুপ্রবৃত্তিগুলি টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া ও নানা প্রলোভনরূপ হিংস্রজন্তু হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে জীবনের বসন্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দেবতার দান যেন দেবতার কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়, ইহাই স্মরণ রাখা প্রত্যেক সংসার কানন-রক্ষিণী জননীর কাজ। তিনি উদ্যানপালকের মত প্রত্যেক বাতাসের দিকে চাহিয়া আপন চারাগাছ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। অবশেষে সেই ফুলের সৌরভে তাঁহার অন্তর বাহির মুগ্ধ হইবে। নতুবা কুবাতাস, কণ্টক তরু, দুষ্ট কীটের স্পর্শে ও নির্ম্মল জল সেচনের অভাবে তাহারা উদ্যানের জড় আবর্জ্জনা হইয়া পথপ্রান্তে লোকের পদতলে গড়াইবে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা।

১৮৯৮—৯৯ ও ১৮৯৯—১৯০০ সালের ডিরেক-টরের শিক্ষাবিবরণী পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর দাঁড়াইতেছে। ১৮৯৪—৯৫ সালে সর্ব্ব প্রকার বালিকা বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল ৩২১৬, ছাত্রী সংখ্যা ৬৪৫৬৭; ১৮৯৫—৯৬ সালে বিস্তা-লয়ের সংখ্যা ৩৩৫৬ জন, ছাত্রী সংখ্যা ৬৫,৯৭৪ জন। এই সাল হইতে কয়েক বৎসরের সংখ্যানুপাত এইরূপ :—

সাল	বা, বিস্তালয়	ছাত্রীসংখ্যা
১৮৯৫-৯৬	৩৩৫৬	৬৫,৯৭৪
১৮৯৬-৯৭	৩২৯৮	৬৫,২১৩
১৮৯৭-৯৮	২৮৯৭	৫৮,৮০৭
১৮৯৮-৯৯	২৭৩২	৫৭,৬১৭
১৮৯৯-১৯০০	২৭১৯	৫৮,৮৩৩১

গত বৎসর বালকদিগের বিস্তালয়ে ৩৮,৯৮৮ ও তার পূর্ব্ব বৎসর ৩৮,০৮৩ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছিল। অতএব গত বৎসর মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৯৭,৩১৯ ও তার পূর্ব্ব বৎসর ৯৫,৭০০। কিন্তু গত বৎসর বালিকা বিস্তালয়ে ২১৫৪ জন বালক পড়িয়াছিল, সুতরাং যথার্থ ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৯৫,১৬৫।

মোটের উপর দেশে স্ত্রীশিক্ষার অধোগতি। ১৮৯৫—৯৬ সালে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১,০০,৭৫৫, গত বৎসর ৯৫,১৬৫। ইহার মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বড় কম। মধ্য বাঙ্গালা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের এবং কলেজের ছাত্রীসংখ্যা গণনার মধ্যেই আসে না।

স্ত্রীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কারণ নির্ণয়ার্থ ছোটলাট ও ডিরেকটর-প্রমুখ অনেক বৃহৎ মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতেছে। চিরকালই জানা আছে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন "আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত, কন্যা বড় হইলে আর তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে দেওয়া হয় না, এবং স্ত্রীশিক্ষকের অভাব, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কি প্রকারে হইবে?" কেহ বলেন "আমরা লেখাপড়ার আদর করি, উহা উপার্জ্জনের পথ বলিয়া। পিতা মাতা আগ্রহ করিয়া পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠান, কারণ তাঁরা আশা করেন যে লেখাপড়া শিখিয়া সে ১০৲ টাকা আনিবে। কন্যা লেখাপড়া শিখিয়াও আর পয়সা আনিবে না, তাই তাঁরা ভাবেন তার লেখাপড়া শিখিবার দরকার কি?" আবার অন্য কেহ বলেন "গবর্ণ-মেণ্টের উৎসাহেই দেশে পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষার এত প্রচার হইয়াছে। সে উৎসাহ না থাকিলে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার এত প্রসার হইত না। গবর্ণ-মেণ্ট পথ দেখান এবং মুক্তহস্তে অর্থব্যয়

করুন, দেখিবেন কিছুদিন পরে স্ত্রীশিক্ষার রূপান্তর হইয়াছে। পরীক্ষার ফল দেখিয়া স্কুলের সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় ব্যবস্থা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে খাটিতে পারে না। পাঠনার বিষয়গুলি স্ত্রীজাতির উপযোগী হওয়া আবশ্যক এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা বিধেয়।

উপরে যাহা বলা হইল সব কথাই ঠিক্, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার অধোগতি কেন হইল সে কথার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, ততদূর অগ্রসর হইয়াছে? "হিন্দুসমাজ" বলিলাম কারণ যে সব বালিকা বিদ্যালয়ে যায়, তাহাদের অধিকাংশ হিন্দু।

স্ত্রীশিক্ষার্থে আজ কাল যে অর্থব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারিলে যে উক্ত শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি পারিতোষিক ও বৃত্তির সংখ্যা বাড়ান যায়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার আকর্ষণ বৃদ্ধি হইবে। যদি অধিক বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক রাখা যায়, তাহা হইলে কিছু উন্নতি হইতে পারে। যদি পুরুষ শিক্ষকের পরিবর্ত্তে স্ত্রী-শিক্ষক রাখা যায়, তাহা হইলে যাঁহারা এখন বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তখন পাঠাইলেও পাঠাইতে পারেন। যদি অধিক ব্যয় করিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ান যায়, তাহা হইলে যাঁহাদের মনে স্ত্রীশিক্ষার কথা এখন উদয় হয় না, কিম্বা যাঁহারা বিদ্যালয়ের অভাবে কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাড়ীর বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠাইতে পারেন। এমন কতক লোক আছেন যাঁহারা কন্যাকে স্কুলে পাঠাইতে উদাসীন, কারণ বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠের বিষয় গুলি প্রায় বালক বিদ্যালয়ের ন্যায়। তাঁরা ভাবেন জ্যামিতি রসায়ন পড়িয়া বালিকাদের কোনও লাভ নাই, দূর হউক ও উৎপাতে আর কাজ নাই। স্ত্রীশিক্ষা যদি অধিকতর নারী-জীবনের উপযোগী ও বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে কতক লোক উহার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন। বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এক প্রধান কণ্টক। একটু আধটু লেখাপড়া শিখিতে না শিখিতে বালিকাদের বিবাহ হইয়া যায়। যেমন বিবাহ, অমনি লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি। সেই জন্য কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন যে বিবাহের পর বালিকারা লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিতে পারে, ইহার যদি কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন হইতে পারে। বিবিধ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক সভা স্ত্রী মহলে ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে অন্তঃপুরিক শিক্ষয়িত্রী রাখেন। ঐরূপ কোন বন্দোবস্ত করিয়া যদি অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে

ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে। কথাটি বেশ এবং কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা বহু অর্থ ও সময় সাপেক্ষ এবং শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য হিন্দু স্ত্রীলোক দুর্লভ। হিন্দু স্ত্রীলোক বলিলাম কারণ শিক্ষয়িত্রী অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলে অনেকে আপনাদের অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত মিশিতে দিতে আপত্তি করিবেন।

উপরে যে কয়টি উপায়ের কথা বলা গেল, তাহাদের কার্য্যকারিতা অনেকটা ভাসিয়া এবং তাহারা বিষয়টীর মূলে প্রবেশ করে না। আমরা জানিতে চাই অল্পে অল্পে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে হইতে হঠাৎ সে বিস্তার বন্ধ হইয়া গেল কেন? এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয়, ততক্ষন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যে উপায়ই উদ্ভাবিত হউক না কেন, তাহা বাহ্য উপায় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না।

প্রায় সকল দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন বা সংস্কার, তাঁহাদের দ্বারাই সাধিত হয় এবং ক্রমে অন্যান্য লোক তাঁদের অনুবর্ত্তী হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আস্থা থাকে, তাঁহারা যদি ইহার উপকারিতা বুঝেন এবং নিজ নিজ পরিবার মধ্যে ইহার বিস্তারের চেষ্টা পান, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত বাধা দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। আমার মনে হয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে, বিক্রমাদিত্যের সময়ে বা অশোকের সময়ে, যুধিষ্ঠিরের আমলে বা যযাতির আমলে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখিবার এখন দরকার নাই। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী ইংরাজ-সৃষ্ট এবং পুরুষশিক্ষা প্রণালীর ন্যায় অনেকটা ইংরাজী ছাঁচে ঢালা। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক মহা বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সুমহান্ ফল। তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কার তরঙ্গ উত্থিত করেন। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় মুষ্টিমেয়। কিন্তু অনেকেরই সহানুভূতি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ছিল। রাজার কার্য্যভার অনেকটা ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়ে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব হয় এবং পশ্চাতে বাবু কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া উপস্থিত হন। সমাজ ও বঙ্গসাহিত্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং সমাজ ও ধর্ম্ম কেশব বাবুর কার্য্যক্ষেত্র। ইহাঁদের সময়ে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাঁরা আপনাদের সময়ের এত অগ্রে গমন করিয়াছিলেন যে অনেকেই তাঁহাদের পশ্চাদ্গমন করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ইহাঁদের প্রভাব কেহ এড়াইতে পারেন নাই। কতক

শিক্ষিত লোকে প্রকাশ্যে ইহাঁদের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। আর অনেকের সহানুভূতি ইহাঁদের সহিত ছিল। যাঁহারা ইহাঁদের সহিত যোগদান করেন নাই বা ইহাঁদের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতিও ছিল না, এমনতর শিক্ষিত লোকও ইহাঁদের প্রভাব এককালে এড়াইতে পারেন নাই। মহাজনের গুণই এই যে অনেক সময়ে অলক্ষিত ভাবে ইহাঁদের মত, বাক্য ও কার্য্য লোকের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে এবং যাঁহারা ইহাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত হইতে পারেন না, তাঁহারাও ইহাঁদের দ্বারা অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং কেশব বাবুর কি আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা যাঁহারা কখনও তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন। আমি জানি শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকে ইহাঁদের সহিত সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্নমত হইলেও ইহাঁদের মহত্ব স্বীকার করিতেন এবং ইহাঁদিগকে ভক্তি করিতেন।

উপরে বলিয়াছি রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যভার অনেকটা ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠিক্ ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁর ঐকমত্য ছিল। রামমোহন রায়ের সময় হইতেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সমাজ সংস্কারের এক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম ফল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইত বলিয়া বোধ হয় না। পুরুষ শিক্ষার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষাও নিদান কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক, অনেকদিন হইতে ইংরাজ জাতির এ জ্ঞান জন্মিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সময় হইতেই শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন এবং প্রথম হইতেই এ সম্বন্ধে সমাজে আন্দোলন চলিতেছিল। প্রথম হইতেই ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারের অল্প-বিস্তর পক্ষপাতী এবং স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা যে পুরুষ শিক্ষার অপেক্ষা কম নয়, ইহা ব্রাহ্মেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই কতকটা রক্ষণশীল হইয়া পড়িলেও স্ত্রীশিক্ষার অত্যাবশ্যকতা কখনও অস্বীকার করেন নাই। আদিসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কেশব বাবু যখন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার তাঁর মুখ্য মন্ত্র ছিল। কেশব বাবুর সমাজ খুব আগ্রহের সহিত স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করেন এবং ইহার প্রচলনে সহায়তা করেন। উচ্চ শিক্ষাতেও যে স্ত্রীজাতির অধিকার আছে, কেশব বাবুর সময়ে উহা স্বীকৃত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাজনের এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের পোষকতা করিতেন না এবং কেশব বাবুর দলভুক্ত ছিলেন না,

তাঁহারাও উক্ত মহাত্মাদের আকর্ষণী শক্তির সীমার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন আমাদের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে অনেকে সমাজসংস্কারক বা ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু তাঁরাও অনেক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা আলোচনা করিতেন এবং কেশব বাবুর বক্তৃতা ও সমাজ গৃহে তাঁর ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহারা অনেকে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং কেহ কেহ পরিবারস্থ মহিলাদের শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতেন।

কিন্তু এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কেশব বাবু ভবসিন্ধুর অপর পারে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের প্রভাবও চলিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আজও আছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এখনও সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু মনে হয় ব্রাহ্মসমাজ এখন নিষ্প্রভ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, ব্রাহ্ম সমাজের আর সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজে এখন মহাজন থাকিতে পারেন, আছেন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এমন কেহ নাই যাঁর কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় চৌম্বকাকর্ষণী শক্তি আছে। বুদ্ধিমান্ লোকদিগকে মাতাইয়া তুলিতে পারেন, এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি দূরে থাক, এখন অনেক শিক্ষিত লোকের সমাজের প্রতি বিরুদ্ধভাব। মনে হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই ভাবান্তর স্ত্রীশিক্ষার অধোগতির প্রধান কারণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড। ইহাঁরা সমাজের নেতা। বালিকা বিদ্যালয়ে যে সব বালিকা যায়, তাহাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের কন্যা। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এবং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সহায়তায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব কমে নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব অনেক কমিয়াছে। দেশের শিক্ষিত লোক বুঝিতেছিলেন যে সমাজের মঙ্গলার্থে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান পুরুষশিক্ষা ইংরাজী ছাঁচে গঠিত। স্ত্রীশিক্ষাও সেই ছাঁচে গঠিত হওয়া দরকার, ইহা অনেকে মনে করিতেছিলেন। ইংরাজ স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে দেখেন, আমরা যদি কতকটা সেই ভাবে দেখি, তাহা হইলে স্ত্রী জাতিকে নিজেদের ন্যায় শিক্ষিত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শিক্ষিত লোকদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় কাজে কাজেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাদান অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। ফল

দাঁড়াইয়াছে স্ত্রীশিক্ষার উজান স্রোতে এখন ভাঁটি পড়িতেছে। কে বলিতে পারে কতদিন এরূপ চলিবে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন আমি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় গালি বর্ষণ করিতেছি। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বীতরাগ নম, কিন্তু ইংরাজী ধরণে স্ত্রীশিক্ষা ভাল বাসেন না। হইতে পারে; কিন্তু তাঁরা হিন্দুভাবে স্ত্রীশিক্ষা দিবার যে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাত দেখিতে পাইতেছি না। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি "আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ইংরাজীনেত্রে আর দে খিতে চাই না, হিন্দুনেত্রে দেখিতে চাই।" ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে "কোন্ হিন্দুনেত্রে; সীতা সাবিত্রীর সময়ের হিন্দুনেত্রে, না মুসলমান বিজয়ের পরের এবং ইংরাজ আমলের পূর্ব্বের হিন্দুনেত্রে?" প্রথমোক্ত হিন্দুনেত্র আমরা কি পরিমাণে ফিরিয়া পাইতে পারি বলা যায় না। দ্বিতীয়োক্ত নেত্র আজও ঠিক্ অতীতের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, এবং চেষ্টা করিলে হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু কথা হইতেছে শ্রীমানেরা যদি ইংরাজী ছাঁচে ঢালা হন এবং শ্রীমতীরা সিরাজের আমলের হিন্দু ছাঁচে ঢালা হন, তাহা হইলে সংসার কি বিশেষ সুখের হইবে? স্ত্রীকে যদি ঘরকন্নার সামগ্রী বিশেষের মধ্যে ফেলা যায়, তাহা হইলে তিনি যে ছাঁচে ঢালা হউন না কেন, বিশেষ কিছু আসিতে যাইতে না পারে; "ধর্ম্মে যে গুরু, বিদ্যায় যে শিষ্য, ব্যসনে যে সখী" এই ভাবে যদি তাঁর প্রতি দেখিতে চাও, তাহা হইলে তুমি যে ছাঁচে গঠিত, তাঁরও নিদান কতকটা সেই ছাঁচে গঠিত হওয়া আবশ্যক মনে হয়। দুই একজন শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়াছি "হিন্দু মহিলা চিরকাল ধর্ম্ম প্রাণা। আমাদের স্ত্রী কন্যা লিখিতে পড়িতে পারুন আর নাই পারুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁরা যদি ধর্ম্মাচরণে রত থাকেন, তাহা হইলে জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বরং তাঁরা নিরক্ষরা হইলে ভাল, ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবকারী ভাব সকল তাহা হইলে তাঁদের মনে স্থান পাইবে না এবং তাঁদের ধর্ম্মাচরণের পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না।" বেশ কথা, কিন্তু ধর্ম্মের গুরুভারটা সম্পূর্ণ ক্ষীণপ্রাণা স্ত্রীলোকের উপর না চাপাইয়া আপনারা নিদান কতক গ্রহণ করুন্ না কেন?

যাহা হউক বাগ্‌বিতণ্ডায় আর কাজ নাই। তর্ক করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষা বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে কয়েক বৎসর হইতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হইয়া সঙ্কোচ হইতেছে। উপরে আমি তাহার একটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে ও আদর্শের পরিবর্ত্তন